KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩০ বি আর. এন. দাস রোড, কল-৩১ 28/2 আর. এন. দাস রোড, কল-৩১
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2/1-2 ?? 3/1-2 3/3-4 Puja Special	Year of Publication : Oct 1977 বৈশাখ ১৩৮৫ Oct 1978 May 1979 Sep 1979
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনুভব

কবিতা পত্র

সম্পাদক ☐ তুলসী মুখোপাধ্যায়

অনুভব কবিতা পত্র

কবিতা ও কবিতা-ভাবনার সংকলন

আশ্বিন ১৩৮৫

অক্টোবর ১৯৭৮

জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী—অমিতাভ চৌধুরী

নির্বাচিত কবিতা — আশিস সান্যাল

কবিতার উৎস — আশিস সান্যাল

দীর্ঘ কবিতা — অমিতাভ দাশগুপ্ত রত্নেশ্বর হাজরা

কবিতা — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিমলচন্দ্র ঘোষ কিরণশংকর সেনগুপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব বসু কৃষ্ণ ধর অমূল্যকুমার চক্রবর্তী সুনীলকুমার নন্দী ফণিভূষণ আচার্য আলোক সরকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সলিল লাহিড়ী প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত গৌরাঙ্গ ভৌমিক বার্ণিক রায় মণীন্দ্র ঘটক সামসুল হক গৌতম গুহ সত্য গুহ শচীন মোদক নারায়ণ মুখোপাধ্যায় দেবী রায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায় পরেশ মণ্ডল ক্ষিতিশ দেবসিকদার উত্তম দাস অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বাদল ভট্টাচার্য ঈশ্বর ত্রিপাঠী মতি মুখোপাধ্যায় অপূর্ব মুখোপাধ্যায় শিশির গুহ সুনীলকুমার দত্ত শ্যামল পুরকায়স্থ শুভাশিস্ গোস্বামী শ্রীকুমার চক্রবর্তী শ্যামল বসু জয়া রায় শুভ বসু অভিজিৎ সেনগুপ্ত ব্রততী বিশ্বাস সীমা মিত্র দীপক কর সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় শুভ মিত্র স্বপন রায় কল্পন নন্দী ঈশ্বর দত্ত বিমল দেব দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জগন্ময় সেনগুপ্ত গৌতম বাগচী উদয়ন ভট্টাচার্য সঞ্জয় রায় কাজল চক্রবর্তী অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় মানবকল্যাণ রায় সুব্রত চেল বিশ্বনাথ গড়াই দুর্গা শর্মা অশোক পোদ্দার কৃষ্ণসাধন নন্দী দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রবালকুমার বসু রাজা মজুমদার তুলসী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ ॥ অধুনা

কার্যালয় ॥ ২৪/২, আর. এন. দাশ রোড, কলকাতা-৩১

নিবেদন

পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ অতল জলের তলায়। লড়ছে সকলে এক ইঞ্চি জমির জন্য। লড়ছে বাঁচার জন্য। ভয়ংকর অসম লড়াই। তবুও শেষ অব্দি মানুষের নির্ঘাৎ জয়। এবং তাই হয়। মানুষের বাঁচার পিপাসার সামনে পৃথিবীর যে কোনো সংহার মূর্তিই হেরে যায়। হেরে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু প্রশ্ন, আমরা—যারা সেই ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে—তারা কি কেবলমাত্র উদাসীন দর্শক থেকে যাবো? না কি প্রকৃত মানুষ-মহিমায় ঝাঁপিয়ে পড়ব সমগ্র পৌরুষে? সমগ্র পৌরুষ এবং হৃৎপিণ্ডের শেষ বিন্দু রক্ত নিয়ে? এবং এই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের তাই তো একমাত্র উজ্জ্বল উদ্ধার।

আশ্চর্য দেশ আমাদের এই ভারত নামক ভূমণ্ডল। বিশ শতকের শেষ ভাগে—একত্রিশ বছরের পুরোনো স্বাধীনতা নিয়েও আমরা আজো যে-কে সেই অসহায় আদিম অন্ধকারে। পায়ে পায়ে খরা-বান-হিমবাহ-মহামারীর অরাজক তামসিক লীলা। মানবতা এখানে মর্মান্তিক পরিহাস! বিশ্বের মানুষ যখন গ্রহান্তর যাবার কথা ভাবছে—আমরা তখনও প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুলমাত্র। এত বিশাল এবং ব্যাপক প্রযুক্তি বিদ্যা আয়ত্বে থাকলেও আমরা আজো প্রকৃতির সামান্যতম ভ্রূকুটীর সামনে দাঁড়াতে পারি না। মানবতা এবং মানবকল্যাণ নিয়ে একত্রিশ বছরে যতো বক্তৃতা হয়েছে—তার কোটি ভাগের এক ভাগও যদি আন্তরিক হ'ত তাহলে অন্তত এই জলপ্লাবন প্রতিরোধ করা যেত অনায়াসে। একত্রিশ বছরের এই স্বেচ্ছাচারী ঔদাসীন্য এবং মর্মন্তুদ অবহেলা ইতিহাস ক্ষমা করবে?

ডাকযোগে কাগজ পাঠাবার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা অতীব ভয়াবহ। ফলে, দূরের লেখকদের নিজেদের উদ্যোগেই কাগজ সংগ্রহ করতে হবে। প্রকাশকের ঠিকানা ছাড়াও ৯/৩ টেমার লেনে দেবকুমার বসুর "বিশ্বজ্ঞান"এ খোঁজ করলে কাগজ পাওয়া যাবে।

কবিতার সঙ্গে পোস্টকার্ড কিংবা ডাকটিকেট পাঠাবেন না। কবিতার ব্যাপারে কোনো মতামত জ্ঞাপনে আমরা অক্ষম।

যাত্রা,
নতুন দেশ,
নতুন মানুষের সান্নিধ্য
নয়তো বা ঘরে ফেরা
আনন্দময় দিন খুশীতে উজ্জ্বল হোক
যাত্রা হোক শুভ।

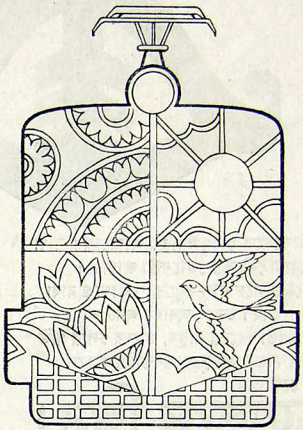

পূর্ব রেলওয়ে

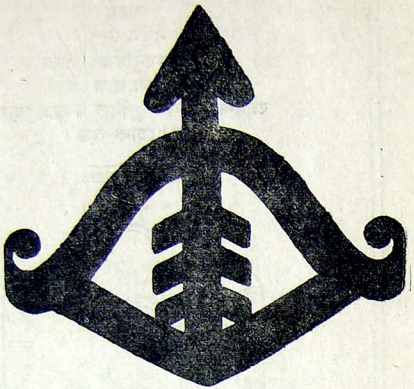

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন। ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

অমিতাভ চৌধুরী

জমিদারিতে : রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রায় সমসাময়িক দুই দিকপাল সাহিত্যিক। বিবাহসূত্রে যেমন এই দুই খ্যাতিমান কাছাকাছি এসেছিলেন, তেমনি আরো কাছে এসেছিলেন সবুজপত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকাটি সেকালে আলোড়ন তুলেছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। এ কাহিনী অবশ্য সকলেরই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না, আর একটি ক্ষেত্রে এই দুই মনীষী একত্র হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পুরাদস্তুর জমিদার, তখন কিছুকালের জন্যে তাঁর এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রজামঙ্গলে দু'জনে হাত মিলিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারী কাজকর্ম নিয়ে আমি একখানি বই লিখেছিলাম। জমিদার রবীন্দ্রনাথ। বইটিতে সবই দিয়েছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জমিদারী হুকুমনামার কোন লিখিত নজির বিশেষ দিতে পারিনি। তার কারণ তখনও এমন নজির পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী হুকুমনামার কয়েকটি লিখিত নজির পেয়ে গেছি। তার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, আছে ঐতিহাসিক মূল্য। এই হুকুমনামার সঙ্গে আর এক প্রতিভাধর সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর নামও যুক্ত। নিচে দেওয়া দুটি নজিরই এযাবৎ অপ্রকাশিত।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনৈক অক্ষয়কুমার সেন একখানা আবেদনে জমিদারবাবু রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

নিবেদন এই অধিনের পরিবারে স্ত্রীলোক এবং ছেলেপেলে লইয়া ৭/৮ জন লোক আছে এবং তাহাদের পুরুষ অভিভাবক একমাত্র আমি। উহাদিগকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দূরে পল্লীগ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া বিদেশে সর্বদা চাকরি করা আমার পক্ষে ক্রমেই অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া উঠিতেছে অথচ এরূপভাবে চাকরি করা ভিন্ন উপায় নাই। হুজুরদের সেরেস্তায় পুনরায় চাকরি গ্রহণ করিয়াছি এবং বিশেষ অসুবিধা না হইলে জীবনের অবশিষ্টাংশ এই কার্যেই অতিবাহিত করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। এ কারণ দেশের বাস তুলিয়া দিয়া হুজুরদের এলেকায় বাড়ি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার

দুটি ভাইপোকে পড়াইবার জন্য সদরের ধারে বাড়ি করার দরকার এবং আমার মত একা প্রাণীর সংসারে কিছু থামার জমি থাকাও একান্ত দরকার। লাহিনী মৌজার যেখানে বাগান হইয়াছিল, সেখানে ২০ বিঘা আন্দাজ সরকারী খাস জমি আছে। উহা বন্দোবস্ত লইলে আমার উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে।

দেশের বাড়িঘর বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইব। তাহা হইতে সরকারের কিছু নজরও দিতে পারিব। অনুগ্রহ করিয়া ঐ জমিটা আমাকে বন্দোবস্ত দিতে আদেশ হইবে। দিনু ঘোষের যে-জমি সরকারের পক্ষ হইতে খরিদ করা হইয়াছে এবং যাহা হইতে ভবিষ্যতে সরকারের কিছু আয় হইতে পারে সে জমি আমি চাহিতেছি না। যে জমি চাহিতেছি তাহা এ জমির পশ্চাত এবং কতটা রেল লাইনের অপর পার্শ্বে। বিদিতার্থে নিবেদন। ইতি সন ১৩২১, ২২শে মাঘ। শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

এই দরখাস্তের উপর বাঁ কোণে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে নোট দেন :— রথী এ সম্বন্ধে প্রমথর সঙ্গে আলোচনা করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই নোটের উপর ১৯১৫ সালের ২৪ জুলাই প্রমথ চৌধুরী নিজে ম্যানেজারকে নির্দেশ দেন :—'ম্যানেজারবাবু অক্ষয়বাবু ভূপেশ অনঙ্গ এবং অক্ষয়বাবুর তিনঘর আত্মীয় এবং একঘর ডাক্তারের বাড়ি তৈরি করিবার জন্য ২নং প্লট দেওয়া যাইতে পারে।—পি সি।

প্রমথ চৌধুরী মশাই, বাংলায় নিজের হাতে লিখে নিজের নাম সই করেন ইংরেজি আদ্যক্ষরে পি সি। তারিখও দেন ইংরেজিতে।

এই নোট ও নির্দেশ অনুযায়ী জমি পেয়ে যান দরখাস্তকারী।

আর একখানা দরখাস্ত জনৈক প্রজা তোরাপ আলি মণ্ডলের। সাকিন চর রাধাকান্তপুর। তিনি লিখছেন—

ধর্মাবতার প্রবল প্রতাপেষু। দরখাস্ত শ্রীতোরাপালি মণ্ডল সাং চর রাধাকান্তপুর অধীনের নিবেদন এই যে সন ১৩২০ সালে চর সদীরাজপুরে ২৬ বিঘা জমি প্রতি বিঘা ২৫ টাকা নজরে কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া ১০০ টাকা দিয়াছিলাম। ঐ জমিতে কিছুই না জন্মায় আমি হুজুরের একখণ্ড দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে হুজুর আমাকে ঐ টাকায় জমি দেওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন। এহি ক্ষণে হুজুরে প্রার্থনা এই যে কোন ফাকি চর

রাধাকান্তপুর মধ্যে উক্ত ১০০ টাকায় জমি কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়। আমি হুজুরের নিতান্ত দুঃখী প্রজা। আমার প্রতি সুলক্ষ্য করিয়া আমাকে ভিটায় বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয়। ধর্মাবতার কর্তা নিবেদন ইতি। সন ১৩২২ সাল ২৮ মাঘ। দরখাস্তের কোণে সদর খাজাঞ্চি এস সি ঘোষ নোট দেন : এ ব্যক্তি গত ১৩২০ সালে সদীরাজপুরের চরে ২৬ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়া তদ্বারা ১০০ টাকা নজর দিয়াছিল। ১৩২০/১৩২১ সালে জমি ও আবাদ করিয়াছিল। ফসলাদি ভালরূপ না হওয়ায় তাহার পরিবর্তে জমি পাওয়ার প্রার্থনা করে। তদসম্বন্ধে পূজনীয় চৌধুরীসাহেব মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন ঐ চরে অন্য স্থান হইতে কিছু জমি দিয়া তাহার নজর মধ্যে পূর্বেকার লওয়া ১০০ টাকা বাদ দিয়া লওয়া হইবে। দরখাস্তকারী সদীরাজপুরের জমি লইতে ইচ্ছা না করায় তথায় জমি দেওয়া হয় নাই। রাধাকান্তপুরের হালপয়স্তি চর হইতে জালি সেচকর হিসাবে ১০ বিঘা জমি দেওয়া হইয়াছে।

এই নোট পাওয়ার পর দরখাস্তের উপরে বাঁ কোণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : জালির জমি যাহা ভোগ করিতেছে, তাহা কায়েমি স্বরূপে দেওয়া যায়। —আর. টি।

এই দুইটি দরখাস্ত থেকে জমিদার হিসাবে প্রজাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝা যায়। তাছাড়া তিনি যে নামমাত্র জমিদার ছিলেন না, প্রত্যেকটি কাগজ নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, তার প্রমাণও এই দলিল দু'টি। সেকালে জমিদারী কাজকর্মে ব্যবহৃত সাধারণ লোকের ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নোটের ভাষাও লক্ষ্যণীয়। দুই সাহিত্যিক এই-ভাবে এক অসাহিত্যিক ক্ষেত্রে আর কোথাও এইভাবে মিলিত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। সেই কারণেই তার গুরুত্ব এড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি নতুন তথ্য উল্লেখ করতে চাই। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ যে-উইল করেন তাতে তাঁর মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বলেন :—জমিদারী সম্পত্তির আয় নিজের ভোগে না লাগাইয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহাতে নিযুক্ত করেন রথীন্দ্রকে সে সম্বন্ধে বারবার উপদেশ দিয়াছি। তদনুসারে এইরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে তিনি যদি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রসন্নচিত্তে উৎসর্গ করিতে পারেন, তবে আমার বহুকালের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তারপরও বলব রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারী জমিদার ছিলেন? দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

সুনীলকুমার নন্দী

ট্রেন ছেড়ে যায়

□

জলভরা মেঘ কখন এসে ভিজিয়ে গেলো, অবিন্যস্ত
সারাশরীর
সামলে নিয়ে, সামলে নিয়ে ট্রাফিক জ্যাম আর পথভাসা জল
পৌঁছতে সেই রাত্রিগভীর

ট্রেন ছেড়ে যায়, হয় না দেখা, জানলাতে মুখ আবছা, রুমাল
উড়তে থাকে—
অন্ধকারে ফিনকি দিয়ে রঙের বাটি খানখানখান
খসলো বোঝা, হালকা হাওয়ায় ফিরে আসি।

আলোক সরকার

কাকাতুয়া

□

যে বাড়িতে কাকাতুয়া থাকতো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না
সেই সাদা রঙের বাড়িটা।
কতদিন এমনি এমনি গেল কতদিন এ-পথে ও-পথে ঘোরা!
ঝুঁটি-বাঁধা মুখর কাকাতুয়া আর সেই নীল রঙের খাঁচা
হাওয়া এলে খাঁচা দুলতো এলোমেলো।
আছে নিশ্চয়ই কোথাও ভালো ক'রে খুঁজে দেখতে হবে—
কাকাতুয়া কথা বলতো এলোমেলো আর নিচে এসে বসতো বিস্ময়
বড়ো-বড়ো উৎসুক দুটো চোখ।
খুঁজে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না কতদিন এমনি এমনি গেল!
সরুগলির শেষপ্রান্তে আবছা দেখা যায় সাদা রঙ
তারপর দেখা যায় অন্য সাদা।
ঠিক সেইরকম সাদা এখনো দেখা গেল না কোথাও
জ্যোৎস্নার ভিতর দিঘি হয়ে যাওয়া সাদা বৃষ্টির পরের মেঘের সাদা।

একটা পথের পর ভাবি অন্য পথ
তখন অন্ধকার নেমে আসে পথ আর দেখা যায় না ভালো
অন্ধকারে দুলতে থাকে নীলখাঁচা আর সেই উৎসুক দুটো চোখ
অন্ধকার ঝিলমিল ক'রে হেসে ওঠে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ফড়িং

□

কাঠগুদামের পাশে একটা ফড়িং একা
খেলা করছে।
তার দিকে দৃষ্টিপাত করো।

একটু দূরে, সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে
একটা লোক হয়তো তোমার জন্যে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তাকে আরো কিছুক্ষণ ব'সে থাকতে বলো।

তুমি এইবার ঠিক জীবনের মাঝখানে
চ'লে আসতে পেরেছো।
ভেবে ছাখো, তার জন্যে অনেকটা সময় কেটে গেছে।
অনেক যন্ত্রণা, দুঃখ, অনেক অদ্ভুত কানাগলি—

তুমি আজ সব ঠেলে
যেখানে এসেছো, সেইখানে
কাঠগুদামের পাশে চঞ্চল ফড়িং শুধু
খেলা করছে।

অন্য কিছু নেই, শুধু একটি ফড়িং—
আর তুমি॥

চতুর্দোলা

□

অন্ধকারে চতুর্দোলা কে জাগালো ?
তারা ফুটছে একে একে, যে-তারা
আমাদের পিতামহ দেখে গিয়েছেন,
আমরা দেখছি, আর আমাদের সন্তানেরা
দেখে নেবে আরো কিছু পরে—

দু'একটা পোকা খুব নড়াচড়া ক'রে যাচ্ছে ঝোপের ভেতরে।
"ভালো থেকো", আমি তাদের উদ্দেশে বলি,
"ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো।"
মানুষেরা এইমাত্র বাড়ির ভেতরে গিয়ে, আলো জ্বেলে দিলো।
"ভালো থেকো, রাত্রে যেন ভালো ঘুম হয়, ভালো থেকো"—
আমি ফিসফিস ক'রে বলি, তারপরে আকাশে তাকাই :

অন্ধকারে চতুর্দোলা কে ছড়ালো ?

বার্ণিক রায়

মা ও মেয়ে

□

মাগো,
আমার কেবলি ডান চোখ নাচে
বিপদ আমাকে কোথায় টানছে বুঝতে পারছি
ওরে মা,
নাচুক নাচুক ডান চোখ যদি নাচে বাঁ চোখও
তখুনি নাচবে, দুচোখের নাচে পৃথিবীর তালে
ছন্দ থাকবে, কেবল মন্দে ভয় পাস কেন ?
দেখেছিস সুতো কলে ওই বেলুন ঘুরছে,
কালো কালো গোল চাকার ওপরে

সুতো খুলে নিয়ে ভীষণ শব্দে
শুধুই ঘুরছে, ছাখ কান পাতা যায় না একটু
দিন রাত্তির শুধু চাকা ঘোরে চোখের সামনে,
বাইরে তাকিয়ে নিঃশব্দে তাকা,
মরচে-জড়ানো টিনের টবের ময়লা মাটিতে
লেবু গাছে পুরু ধুলোর স্তর জমে আছে ওর পাতায় পাতায় ;
আকাশের দিকে মাথা নিচু করে
বিষণ্ণ মনে জানলার ধারে চাকা থেকে সুতো
খোলার খেলার স্বপ্ন দেখছে অজান্তে ওরা।

এমনি পাতার স্বপ্ন কোথায় পাবো আমি মা

স্বপ্ন কোথায় পাবি পৃথিবীতে, বুকের ভেতরে
গাঢ় অরণ্যে কান্নার চাঁদ জাগিয়ে থাকবি একা।

দূর শৈল প্রান্তরে

□

দূর শৈল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছো একা
রাত্রির বিরাট চাঁদ তোমার পেছনে
মুখ দেখা যায় না তোমার
তোমার নিবিড় কালো চুল বাতাসে পাহাড়ে ওড়ে
উঁচু পাহাড়ের বুকে মেঘ শুয়ে আছে
নদীতে তখন নীচে ভীষণ গর্জন
ঝরঝর বৃষ্টি
আমার মাথায় ছাতা নেই
পাহাড়ের উঁচুনিচু আঁকা-বাঁকা পথ
পাশে খাদ
বৃষ্টি থেমে যেতেই সহসা চাঁদের রোদ উঠলো পৃথিবী জুড়ে
তুমি ভেসে উঠলে আলোর মতো
তার ছায়া আমার ওপর

দেবী রায়

কলকাতা

□

সুখ, বিড়লার-ও নেই—
আর আমি' কোন ছার
যে, সব কথায় কাৎ করবে—ঘাড় !

মনে ক'রো, আমি-ই সেই—
কলকাতা' যে অনেক সয়েছে
আর দেখেছে, তারো চেয়ে-ও বেশি,
ঈর্ষা ও ঘৃণায় মেশামেশি !

ভূগর্ভ-খোঁড়ার' দুরন্ত-বিপ্লবে
হায়, চোখের জলের দিন !
কবে শেষ হবে ?
যা আছে, যা ছিলো মনে ও মননে

—রূপ দেখাবে, কলকাতা ?
একদিন, প্রকৃত-বাস্তবে !

রেখেছি বুকে, রেখেছি বটে—এই হাত
তা বলে কি ভাবো :
'এ-তোই সহজ, আত্মায়-সাক্ষাৎ !'

মনে রেখো, আপাততঃ স্বাচ্ছন্দও
পাবে না
ট্যাপ-ওয়াটারের ছিড়িক-জলে
বরং পারো, গা-ভেজাতে
চুল' তুমি কখনোই ভেজাবে না !

আর নয়, কান্নাকাটির সময়' বড়ো জোর
রুমাল-টা এগিয়ে দিতে পারি :
'হে নারী, হে আমার ব্যক্তিগত নারী !'

কবি

□

খাটের ফ্রেমের চারদিকে, মশারীর চারটি খুঁট
আট্‌কে দেয়, আর তার ঘেরটুকু গুঁজে দেয়,
তোষকের নিচে যে, সে নিশ্চিত কবির বউ

মশারীর বাহিরে তখন, দলবেঁধে
মশার-ঝাঁক মরণপণ ওড়ে, বুঁ বঁ শব্দে
ঘুরে-ফিরে প্রতিবাদী-হামলা, সবেগে চালায়

হাঁউ-মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ' বোবা-ভাষায়
এইসব বলে, মুখোমুখি' মশারা পরস্পর
কেননা, তাদেরো 'ত রয়েছে উদর !

আর উদর থাকা মানে-ই 'ত খিদে চাগায়
তখন তারা দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বস্‌তে
পারে না, নিশ্চিন্তে—ঘুমোতে পারে না

নাইলন-মশারীর ভিতরে, ধবধবে বিছানায়
শুয়ে, ক্রমাগত ছটপট করে—কবি
মশা নয়—মাছি নয়—এমন কি—

বিরক্তিকর' কোনো উড়ন্ত-আরশোলা ছুঁতে
পারে না, ঐ কবি কে, যতোখানি শুষে খায়
উপেক্ষার মানসিক চাপ, ছিঁড়ে খায়, ঠোকরায়,……!!

ক্ষিতীশ দেবসিকদার

অনুভব

□

যুবকের
জলজ্জল চোখে তুমি গেঁথে দিলে তীর
তদবধি অস্থির পঞ্চমে বসবাস
মনে হয় আলো নেই এক লক্ষ বছরেরও বেশী !
কতটা তীক্ষ্ণতা ছিল তীরে
কতটা হিংস্রতা ছিল তীরে
কতটা নিশানা ছিল তীরে
কিছুই বোঝার আগে
ধরাশায়ী যুবকের মৃতদেহ দাহ করে ফিরে এলো শ্মশান বন্ধুরা
সেইখানে
যেখানে পথের ধারে রাশি রাশি ফুটন্ত পলাশ।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

মানুষের কাজে

□

তারো ছিল ইঁদারার জল, ছিল ঠাণ্ডা নীল চাঁদ
আমের পল্লব ছিল, সিঁদুরে লাজুক ঘটপট
অন্তত জানত সে তো করে নি কঠিন অপরাধ
মানুষের কাছে, তার উঠোন ঘাটের জল সবই অকপট
হাওয়ার উপযুক্ত ছিল, তবু কেন ক্রমে এক উটকো বিষাদ
সাপের মতোন তার লম্বা গলা চুপিসারে সেঁধিয়ে দিয়েছে জানালায় ?
এজন্য সে কার কাছে যাবে ? তবু মানুষেরই কাছে যাওয়া যায় ?

তাও গিয়ে দেখা হোলো, হয়েছে গহন কিছু ক্ষতি

মুলসুদ্ধ লাউশাখা দাঁতে কেটে নিয়েছে ইঁদুরে
হাজামজা ইঁদারায় ক্ষয়ে ম'রে গেছে চাঁদ, এবং অদূরে
চোদ্দো পুরুষের ভিটে খেয়েছে জংগলে। তবু এসব উল্লেখ্য কিছু নয়,
ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া—এই তো স্বভাব-পরিণতি।
তবে কি আবার ফিরবে জলের অবগাহনে, প্রান্তর চাঁদের শুশ্রূষায় ?
তা কি হবে ? কথনো হবে কি আর ? মানুষের হাতে পাওয়া দুঃখ জানাতে
মানুষই রয়েছে বাকি ? ছিন্ন পাতার মতো ঘুরে ঘুরে তারই কাছে যাওয়া
আসা যাওয়া ?

দুর্গা শর্মা

ভুল বয়সের ক্রীতদাস

□

এই ধরো ক্ষয়ক্ষতি নষ্টবীজ বিছানা বালিশ
চিতা থেকে তুলে নিচ্ছি মোহ শুধুমাত্র
অন্তর দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দাও তুমি সুখ
দুঃখের অপর নাম মোহ নয় জানি
মানুষের দুঃখ থেকে যায় এইভাবে

প্রতিজ্ঞা করেছি বলে নয় এই ধরো জন্মদিন
জাবর কাটার মত সহজ পদ্ধতি
বাঘনখি হার, আর ঠনঠনে বালা
অতসী গাছের নীচে পোঁতা আছে দ্যাখো

এই রাখি অন্তর্বাস আয়না আপেল সব
বর্ণমালা বীজমন্ত্র শুনে শুনে নাও শুধুমাত্র
অন্তর দিয়ে আমাকে চেপে ধরো তুমি দুঃখ
আমি ভুল বয়সের সেই ক্রীতদাসকে ডেকে আনি।

অশোক পোদ্দার

ক্রীতদাস

□

অবিরাম খরচ হয়ে যাচ্ছে মানুষ
সমুদ্র সৈকতে ঝলমলে সাজানো শহরে
শ্যামল শৈশব কিংবা সোনালী যৌবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লাগাতার
দুঃখের আঁধারে আর হতাশার শীতল তুষারে।

অদ্ভুত সে সমস্ত শব্দ যা মৃত্যুর
যন্ত্রণার দারিদ্র্যের ব্যর্থতার
আটাহুয়াল্পা টুটেনখামেন ডায়নোসরের ফিমার
আজ নতুন খবর নয় ;
পগেয়াপট্টি হতে অক্ষয়ের ফুলের দোকানে যেতে সুন্দরী ট্রামে
দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

ব্যস্ততা দিনরাত ঘিরে আছে আমাদের
জিবছোলা উষ্ণ চায়ের ধোঁয়া দাড়ি কামাবার গান
নারী মাংসের ঘ্রাণ টেলিফোন টিভি ফ্রিজ রেকর্ড প্লেয়ার
রক্তমাখা রাজনীতি বেকার সমস্যা ক্ষুধা জন্ম নিয়ন্ত্রণ

লক্ষ লক্ষ রোবটের কণ্ঠ হতে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তুমুল গর্জন—
টাকা...টাকা...টাকা...টাকা...টাকা..টাকা...

রত্নেশ্বর হাজরার দীর্ঘ কবিতা

মুন্নালাল, তার গাড়ি—এবং

□

গাড়ি ছেড়ে দাও, মুন্নালাল ! তোমার গাড়ি আজ বড়ো ভয়ংকর
তোমার গাড়ি
আজ তোমার অবাধ্য হয়ে উঠেছে
ঝড় ঢুকেছে তোমার গাড়ির মধ্যে আজ
নিয়ম মানছে না কানুন মানছে না—রাস্তার ট্রাফিককে
দেখাচ্ছে লাল চোখ
নিরেট পিচ্ তুলে ফেলছে আঙুলে
ফোটা কদমের মতো ফুলে ফুলে উঠছে শরীর
তার অহংকার
রোদকে শীতল করতে চাইছে, বাতাসকে অবশ করতে চাইছে
কোনো আধিপত্য সে আর মানতে চাইছে না, মুন্নালাল !
সব ক'টা ফাঁকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আদিম জঙ্গল।

ওকে দেখে হাইওয়ে থেকে মাঠের মধ্যে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে অনেকগুলো গাড়ি
খবর এসেছে কনট্রোলরুমে। ওর সামনের চাকা থেকে
নখ বেরিয়ে পড়ে আক্রমণের জন্য.....
কেশর ফুলে ওঠে চরম মুহূর্তের মতো.....সারারাত
হেড লাইট সরিয়ে ফেলে এক লক্ষ চিতার চোখ বসে থাকে
শেষ আক্রমণের অপেক্ষায়। মুন্নালাল
বেঁধে রাখলেই কিন্তু আক্রোশ বেড়ে যায় অহংকারের
বেঁধে রাখলেই
আক্রমণ করতে চায় অবরুদ্ধ, মুন্নালাল
শেষ খাদ্য গ্রহণের জন্যও অন্তত একবার ময়ীয়া হয়ে ওঠে
যে ক্ষুধার্ত, আর
অভিশাপ নামক সেই বিখ্যাত প্রকাশ

তা-ও তো নয় কারুর একচেটিয়া !
হ্যাণ্ডস্ আপ্, বললেই হাত তুলবে সে—
যে, হয় ভীতু নয় তো অপরাধী—

এই রাজপথের পাশেই কোথাও কোথাও আছে মন্দির
ঘণ্টা বাজিয়ে সেই সব মন্দির খোলে পুরুতেরা, আর
ওরা হাত তুলে নমস্কার করে
এই ভণ্ডামী আর কদ্দিন চলবে ! চালাকি-ই তো শেষ মন্ত্র নয় !
পাথর যদি বিরাট কিছু হয় তো মানুষ আরো বিরাট কিছু নয় কেন !
মাহাত্ম্য আরোপিত হয় প্রস্তরখণ্ডে
কিন্তু যে আরোপ করে সে কি পাথর ?
পাথর নিয়ে এই খেলা আর কদ্দিন চলবে ওদের !
দেখেছ তো—শুকনো পাতার মতো হাওয়ায়
উড়ে যায় তখনকার দক্ষিণা
কিন্তু কোথায় উড়ে যায়, মুন্নালাল ! তোমার পথের
কোন্ পাশে কোন্ অন্ধকারে অবজ্ঞাত হয়
কে তাকে গ্রহণ করে ! কেউ কি করে ?
সমস্ত আরোপ কি মাহাত্ম্যের গন্ধে লিপ্ত হয় কোনোদিন
সমস্ত মৌচাকে মধু পেয়েছে কোন্ সংগ্রহকারী !
শাদা চাদর পেতে জীর্ণ মানুষ—আমি—শুয়ে আছি
আমার ময়লা শরীরের গন্ধে উড়ে আসছে মাছি এখন
তালপাতার বাঁশি বাজিয়ে একা মাঠ পার হওয়ার
কথা আছে এক শিশুর
ভণ্ডামী জানে না এমন শৈশব আর কদ্দিন থাকবে ওর !
ওই মাঠ পার হলেই তো রাজপথ, মুন্নালাল
তালপাতার বাঁশি ফেলে দিয়ে সে
দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ির জন্য
এবং গাড়ি থামে-কি-থামে না—ফুটবোর্ডে
পা তো রাখতেই হয় তাকে
আর যে মেনে নেয় তার কাছে খুব সহজ ঐ ভিড়

ঐ ক্লান্তি
ঐ ক্লান্তির দুর্গন্ধ
ঐ দমবন্ধ করা বিরক্তি—ঐ
ইচ্ছা অনিচ্ছার দৌড় ঐ স্বাচ্ছন্দ্যহীন ধাবমানতা।

কিন্তু মুন্নালাল, এককালে তোমার ছিল রথ সেই রথেই
যেতাম ভ্রমণে এবং যুদ্ধে, যেতাম বনভোজনের হুল্লোড়ে
যেতাম অলৌকিক বনবাসে—
এবং তুমি-ই তো সেই সারথি, মুন্নালাল
যার রথের চাকায় কেটে ভাস্কর্য তৈরি করেছিলাম
পাথর থেকে
যার শব্দে একদিন গান বেঁধেছিলাম
শিকার যাত্রার আগে
যার পতাকার হাওয়ায় হাওয়ায়
গন্ধেরা আলাদা হতে শিখেছিল একদিন
শয্যা থেকে পাশাপাশি উঠে দাঁড়িয়েছিল
পাপ আর পুণ্য—
তখন আমার লোমকূপ দখল করেছিল অহংকার
তখন আমার লোমকূপ
দখল করেছিল অভিমান
বেদখল নিচ্ছিল ক্রোধ চালাকি আর সংযমহীনতা—
আমার রক্তমাখা বীর্য
ধাবিত হচ্ছিল বংশপরম্পরার জন্য।
দধীচির হাড়কে তো স্বর্গের দিকে বহন করছিল তোমারই রথ
ঐ রথেরই পতাকায় চড়ে নেমে এসেছিল
প্রখর বজ্র—
আমার বিষুবরেখাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে সে একদিন
সমান দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে
কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তিকে
সাড়ে ২৩ ডিগ্রী অক্ষাংশের কাল্পনিক দাগ তো

তোমার সেই রথেরই চাকায় তৈরি হয়েছিল
আমাদের কল্পনায়—। মুন্নালাল
সরলবর্গীয় কোনো বৃক্ষের ছায়ায় আমাকে
বসিয়ে রেখে ডেকে এনেছ ঋতুমালা
শৈশব বাহিত হয়েছে কৈশোরে
কৈশোর যৌবনে আর যৌবন
এখন তোমার গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে
চকিতে পা তুলে দেবার জন্য—

এবং এখনি পাতা-ঝরা শুরু হলো, মুন্নালাল
আমার বাগানের প্রত্যেকটি গাছের ডাল থেকে
কমবেশি পতন আমি লক্ষ্য করছি অনেকদিন—
আমি স্পর্শ করছি মায়া নামক সেই বিখ্যাত অনুভূতি
চাইলে এঁকেও দেখাতে পারি বন্ধনের আকৃতি কেমন
সহিষ্ণুতাও আমার রক্তে আসা যাওয়া করে আজকাল প্রত্যেকদিন
আমার রক্তের চাপ বাড়ছে বা কমছে আমার নিজস্ব
আমগাছের মুকুল ঝরে পড়ছে ধুলোয়
আড্ডা বসছে বিকেলবেলার পার্কে
মেয়েদের উপর আসক্তি এলোমেলো হয়ে যায় উদাসীন
আকাশ দুলতে থাকে জলের মধ্যে। মুন্নালাল
তোমার গাড়ির চাকায় ফালা ফালা হয়ে যাবে আমার চামড়া, তবু
আমার অনেক আদিম আগ্রহ
আছে তেমনি অটুট, তবু
লক্ষ্যবিদ্ধ করার সেই চোখ
সরে সরে যায়—সরে সরে যায়।

বাতাস এখনো দুর্বল হয় লেবু ফুলের গন্ধে। মাঘেও
কুয়াশা পড়ে আগের মতোই
কালপুরুষ ওঠে এবং নেমে যায় প্রাকৃতিক নিয়ম মান্য করে
এদিক-ওদিক হয়—এলেবেলে হয় রাজনীতি

নড়বড় করে অর্থনীতির সংজ্ঞা
একটা ফড়িংয়ের ঘাস থেকে ঘাসে লাফিয়ে যাওয়ার মতো
এক মুহূর্তেই
কনট্যাডিকশন ছড়িয়ে পড়তে থাকে যাত্রীদের মধ্যে। মুন্নালাল
পাড় ছিঁড়ে ধুতি পরার রেওয়াজ কিন্তু যায়নি এখনো
যার আছে তার আছে
কিন্তু যার নেই সে-ও তো নাঙা পাছায়
তোমার গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছে—
একটা টিকেট দিতে পারো নাকি হে? মনে রেখো
ওর রুক্ষ চুলের মধ্যে কিন্তু একটা টেলিস্কোপিক রাইফেল
লুকোনো আছে—পুরো ভর্তি
এবং সেফ্‌টি ক্যাচ তুলে দেওয়া
নাগালে পেলে কিন্তু ওই নাঙা-পাছার লোকটা
পাড় ছিঁড়ে ধুতি পরনেওয়ালাদের না-ও ছাড়তে পারে।
নাঙার আর ভয় কি হে। যার আছে তারই তো বাটপাড়ের ভয়
ল্যাংটো হবার ভয়—। তবু
যাচ্ছে সবাই একই সঙ্গে—যার আছে এবং
যার নেই—দুজনেই অপেক্ষমান
তোমার গাড়ির জন্য
একজন মাতাল আর একজন
মদ দেখেনি কোনোদিন—

আহা! কাঙাল আর কাকে বলে—। তোমার গাড়িতে
দিন পার হয়ে যাবার কথা জন্মদিন থেকেই—রাত্রিও
পার হয়ে যাবার কথা, তবু
ওঠার জন্য চেষ্টা করছি কেবল—উধাও হয়ে যাবার জন্য—
হঠাৎ লাফিয়ে ওঠার দুর্মতি নিয়েও চেষ্টা করছি, মুন্নালাল!
দিন যায়—পাতা ঝরে পড়ে—ডাল শুকনো হয়
আকর্ষণ বেড়ে ওঠে তোমার গাড়ির জন্য। তুমি ডাক দাও, তবু
কেবল বলি—গাড়ি ছেড়ে দাও, গাড়ি ছেড়ে দাও, তোমার

রথের চাকা চিহ্ন রেখে দিচ্ছে ঐ ধুলোয়
ঐ পাতায় ঐ ঘাসে ঐ জলের উপর
আমার এই অবয়বে—আমার চামড়ায়—আমার
প্রত্যেকটি কোষে চিন্তায় অনুভূতিতে। আমি
যেতে না চাইলেও তুমি তো আমাকে তুলে নেবেই। তুমি
জায়গা রেখেছ আমার জন্য আমার জন্মদিন থেকে—
আমাকে দেখলে তোমার গাড়ি আর নিয়ম মানতে চায় না
রাস্তার ট্রাফিককে দেখায় লাল চোখ। ফোটা কদমের মতো
ফুলে ওঠে তার শরীর। হেড লাইট বদল করে
বসে থাকে এক লক্ষ চিতার চোখ
শেষ আক্রমণের অপেক্ষায়—।
কাকে আর বেঁধে রাখবে! মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে অশ্বেরা
আর বেঁধে রাখলেই তো আক্রোশ বেড়ে যায় অহংকারের।
আমার কাছ থেকে এখন একটু সরে যাবে তোমার ওই
উজ্জ্বল রথের ঘোড়াগুলো নিয়ে তোমার চরম ধাবমানতা
একটু ভুলতে দাও, দেবে?
আমি তো যাবো—এবং যাবোই—তবে
আর কয়েকটা দিন পরে—। হায়
কাঙাল আর কাকে বলে!

ষাটের দশকের সব বিশিষ্ট কবির সচিত্র জীবনপঞ্জী সহ

ষাটের বাংলা কবিতার এক লক্ষ্যভেদী উজ্জ্বল দলিল

সময় ষাট

প্রস্তুত করেছেন ষাটেরই অন্যতম বিশিষ্ট কবি শান্তনু দাস

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত

□

সারাদিন ধরে
করাতের একটানা শব্দ।
মাঝরাতে
কুকুরের পিছু পিছু
মহাপ্রস্থানের পথে—
করাতের শব্দের মধ্যে
বাড়ি।

আবার কালো কফির সকাল।
করাতের শব্দ।
বুকে পেটে জংঘায় হাঁটুতে
ইঁদুরের দাঁত
কুঁচি কুঁচি বই।

বেশিদিন নয়।
গাছটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।
করাতের শব্দ।

কিন্তু ফুল ফুটছে।
কিন্তু ফুল ঝরছে।
কিন্তু করাতের শব্দ।

গাছটা শুয়ে পড়বে বিছানায়।
করাতের শব্দ।
শব্দ ছাপিয়ে
গন্ধ
বর্ণ
ধ্বনি……

পরিবর্তন

□

কিনে আনলুম
আর সেই থেকে নিজেও কেনা মানুষ।

ধরা যাক্ কালো মাটির কুঁজো।
থাকতে লাগলুম।
বেমালুম গ্রীষ্ম···
শীতের রাতে লেপ,
থাকতে লাগলুম।

দুয়ো উত্তুরে হাওয়া
দুয়ো ছেঁড়া রুটি
দুয়ো নেই নেই চিৎকার—

তারপর একটা ফ্রিজ এল
দরজা বন্ধ
আর হিহি কাঁপা ঘর
লেপটা টুকরো টুকরো

ভীষণ তেষ্টা
দরজা খুলতেই
কমলাপাড় স্কোয়াশের বোতল
গুণগুণ বরফজমা

দরজা সেই যে বন্ধ
তেষ্টায় ঠাণ্ডা জল—
কাঁপুনিতে একটু গরম—
দরজা খোলেনা—
চারপাশে বরফ জমছে—

হঠাৎ বৃষ্টি

□

হাওয়া এসে দোয়াতটা ঠেলে দিল।
সমস্ত লেখার ওপর অন্ধকার।
ইলেকট্রিক তারে বসা কাকের দল এলোমেলো।
যে যার ঘরে ফিরছে।
বাস্ চলে গেল।
বাস্ এল। চলে গেল।
সিগার জ্বলছে। ছাই বাড়ছে।
হঠাৎ
একশোটা ঘোড়া কেশর ফুলিয়ে—
তাদের গায়েও কালির দাগ।
ঠিক তখনই
বনের বিশালতম মৌচাক ভেঙে
টুপটাপ মধু—
উপছে পড়া কল্সী
আর যেখানে সেখানে কালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে
সব ধুয়ে মুছে গেল।
সিগার নিভেছে।
কল্সী ছাপিয়ে পড়েছে।
স্নানের শব্দ—
আকাশ বাতাস মাটি
শান্তি শান্তি শান্তি

রাত থেকে ঘুমের ভেতরে

□

বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে
সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের বনে শব্দ
পায়ের আওয়াজ
দীর্ঘশ্বাস—

জ্যোৎস্নায় শয্যায়
শরীরের উঁচুনীচু রেখা—
আকাশকে দেখে
লজ্জায় চাদর টেনে দেওয়া।

কে যেন ঘরে এল,
আকাশে ছায়া—
ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে
ফুলের ওপর এলিয়ে পড়ল।

বাতিটা ফুঁ দিতেই
ইচ্ছা ছিল ঘুম—
ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে
নুয়ে প'ড়ে
যে এসেছিল,
আকাশে ছায়া,
ছায়ায় মুখ মুছতে মুছতে
নেশায় ভাসতে ভাসতে
সে নিজেই ঘুম……

এই অপ্রেম এবং মর্মান্তিক অসময়ে একটি দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ

দুই বসন্ত

পঞ্চাশ এবং ষাটের বিশিষ্ট কবির প্রেমের কবিতার সংকলন
আগামী বৈশাখেই বেরুবে।

সম্পাদনা ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি সপ্রতিভ হেঁটে গেলে

□

তুমি খুব সপ্রতিভ হেঁটে গেলে
হৃদয়ের সরু রেখা যেন এক নদী
সমস্ত ট্রাফিক যেন টাল খায় পায়ের তলায় :

তুমি হেঁটে গেলে
গল্পের আসরে মাতে শর্করা লোভীরা
ভিখারির শোভাযাত্রা খুশি স্বপ্নে হয়ে যায় মশগুল মানুষ…

সপ্রতিভ হেঁটে গেলে
আষাঢ়ে শস্যের ছবি ; এলোকেশী জল ঝরে শস্যের শরীরে
'শরীর' শব্দটা নিয়ে খেলা করে রাজহাঁস মেঘেদের দল।

হৃদয়ের সরু রেখা নদী হলে বল্মীকের স্তূপ ভেঙে যায় ;
আমাদের রুগ্ন শীর্ণ স্মৃতি—
ঠোঁটে করে নিয়ে আসে প্রথা, প্রেম, অবসাদ, যৌন অহংকার
ধুয়ে গেলে ধর্মগ্রন্থ, মুছে গেলে আমাদের পাপ,
আজন্ম প্রত্যাশী হয় সপ্রতিভ হাঁটার দুধারে।

বিস্ফোরণ

□

আমার ইচ্ছাই আমাকে একটানা বেয়ে নিয়ে চলে
বিভোর হওয়ার মত আমার কোনো অবলম্বন নেই
বিস্ফোরণ মুহূর্তের আগে সমস্ত শরীর ভরে জ্বালা
বিস্ফোরণ শেষে শব্দের সহাস্য মুখ, নিশ্বাস পতন
আমারই ইচ্ছার স্রোতে ভেসে যায় কিনারাবিহীন।
ডুবো চাপে ভেঙ্গে যায় ব্যূহ বেঁধে ঘরে থাকা মননের তুচ্ছ কোণটুকু—
ঘরছাড়া তন্ময়তা, আকাশের সুবিশাল খেলা

সৌরশব্দ গতি মেঘ আর এক শূন্যের কাছাকাছি
আমি যেন যুক্ত হই ইচ্ছার নিটোলে।
বিস্ফোরণ শেষে মেরুদণ্ডে বিনষ্ট স্মরণ
অদৃশ্য সহস্র হাতে প্রার্থনা জানায়
অবলম্বনহীন ছাড়া কার চোখে পাল তোলে অগাধ মোহনা……
ঘরছাড়া তন্ময়তা, আকাশের সুবিশাল খেলা
অভিজ্ঞানহীন বসে থাকা শেষে কার চোখে এঁকে দেয়
শস্য ছবি মাটির ঝলক ;
অনুপ্রাণিত মন অসম্ভব স্নেহ নিয়ে মাটিকে জড়ায়।

মঞ্চ থেকে একটু দূরে

□

মঞ্চ থেকে একটু দূরে আমি জেগে থাকব
তুমি কথা বোলো ;
আমার জন্যে প্রাজ্ঞতা নয়
আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখব ঘাসের ডগা
কেমন করে তোমার সম্ভাবনাকে দোলায়।
তোমাকে না দেখলেও
আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে ছুঁয়ে থাকব।

মঞ্চ থেকে দূরে হলেও
আমি অভিন্ন এক সমতলে দাঁড়িয়ে আছি
যার সবটুকু জুড়ে আমার একটি মাত্র নগ্ন ইচ্ছা
বিদ্যুতের মত কাঁপছে ;
থিতোন স্মৃতির আচমকা ফাটল
যাকে বারবার মুখোমুখি করছে তারাদের ;
তবু আমার চারদিকে অন্ধকার
যতক্ষণ না তোমার কথার অনবদ্য ছায়া
আমার শরীরের সবকটা কপাট খুলে দেয়
যতক্ষণ না আমি জানি
উষ্ণতা আর শীতলতার মাঝামাঝি কোনো ফাঁক নেই।

বাদল ভট্টাচার্য

ভিন্ন রকম

□

ঘর বেঁধেছি ভিন্ন রকম
আউল-বাউল রাস্তা হাঁটি ;
মন রেখেছি বন-জাকুলে
আগলে মুঠি কোমল মাটি।

ঘর বেঁধেছি রাত দুপুরে
খিল খুলি তাই অন্যমনে ;
হঠাৎ হাওয়া পর্দা নাড়ে
শব্দে ঝরে হাজার মানে।

ঘর বেঁধেছি চলতি পথে
খুঁদ-কুড়ো নেই এমনি বাঁচি ;
মুক্ত মঞ্চ মহান আকাশ
কাল আকালের সব্যসাচী।

ঘর বেঁধেছি বুকের ভেতর
সোনার কমল অমল ছায়া ;
আগলে দুয়ার মায়ের মত
আঁচল পাতে রাতের মায়া।

অন্তিম বিষাদ

□

কোথায় লুকোবে মুখ !
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে যেখানেই যাও
অদৃশ্য কালের হাতে
দোলে হাথ দর্পিত দর্পণ :

নষ্টকীট ছুঁয়ে গেলে
গোলাপের গোপন আবাস
আলো তার ঘ্রাণ বোঝে,
মাটি জানে সেই ব্যথা···
কত তার ধুয়ে নিলো অজস্র শ্রাবণ !

বুকের গোপন সেতু
যে কেউ পেরিয়ে গেলে
নম্র ছায়া দুলে ওঠে
স্থির জলে—নিভাঁজ হৃদয়ে ;
ঠোঁটের নিপুণ খাঁজে জেগে ওঠে
পূর্বাপর নিবিড় মধ্যাহ্ন।

কোথায় লুকোবে মৃথ !
অন্ধকার অন্ধ বড়ো
পাদপীঠ পিচ্ছিল করুণ ;
দৃশ্যের আড়াল ছুঁয়ে
যা কিছু অমৃত ভাবো
সমস্তই অন্তিম বিষাদ।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

ভূমিকম্প

□

গর্ভস্থ ভ্রূণের মত যারা লিপ্ত তোমার সত্তায়
তারা টের পায়
কখন কাঁপবে তুমি, কোন দিন তোমার সহন
ছাড়াবে শীলতামাত্রা—সমবেদনায়
ফুঁসে উঠবে জলরাশি, বনে বনে প্রলয় দহন।

শিশুর মতন ওরা কোলে থাকে খায় ও ঘুমায়
মায়ের গভীর জানে, তাপমাত্রা জানা হয়ে যায়
কাছাকাছি থাকে খুব একেবারে গলাটি জড়িয়ে
অই ক্যাট মাছগুলি ইঁদুরেরা, সাপ ও কুকুর।

মানুষের থেকে ওরা বেশি ন্যাথে, মানুষের মগজের থেকে
তোমার শিউরে ওঠা
অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা নিয়ে
হৃদয়ে হৃদয়ে ওরা পেয়ে যায় ঘ্রাণ
কোথায় তোমার ব্যথা, কখনই বা সেই অভিমান।

মানবকল্যাণ রায়

দিন-যাপন

□

চারপায়ে হেঁটে যায় চারপাশে
মানুষেরই মত কিছু মানুষ
ক্ষুদ্র তৎপরতায় খুঁজে
সাময়িক নিরিবিলি বাসা

খুশী হাতে নারিকেল নাড়ু
মনে নেই কবে যেন চলে গেছে
টয় ট্রেনে চড়ে সব সাধ
আধো ঘুমে বসে থাকা শুধু

শিথিল যন্ত্রণার শিরাগুলি অপেক্ষমান এখন
বড়ো অনিয়মিত রোদ এখানে ॥

শুভ মিত্র

শব্দকোষ ভেঙ্গে

□

কোন এক নির্জন দুপুরে
অলস ছায়ায় দাঁড়িয়ে
'শব্দকোষ' ভেঙ্গে তুমি আমায়
নিষিদ্ধ ফল খাওয়ালে ;
তখনই শরীর থেকে খসে পড়ল শরীর,
চোখের থেকে চোখ—
আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম—
ফিরিয়ে দাও আমার শরীর,
আমার দৃষ্টি আর সংস্কার……।
অমনি, অন্ধকার থেকে টুপ করে
ঝরে পড়ল একটা আলো……
আমি নিজেকে দেখে চমকে উঠলুম…।

শাশ্বতী

□

যেমন জলের মধ্যে মিলায় প্রতিমা,
তেমন বিসর্জন কেন ?
জানি, মৃত্যুর বিকল্প নেই…।

তবু থাকে অঙ্গরাগ, হিরণ্ময় খেলা,
আজন্ম শস্যের স্নান……।

জলের মধ্যে শুধু বিসর্জন থাকে,
মাথার ওপরে জ্বলে নিরঞ্জন আকাশ……।

স্বপন রায়

পঞ্চ ইন্দ্রিয়

□

সমস্ত দরজা খুলে দিতেই,
নীরব উচ্চারণে সরব হয়ে ওঠে বালক
'আমি সব কিছু ছুঁতে পারছি,
ধরতে পারছি, এতেই আমার সুখ' ..

রাজার মত আস্বাদ করছি
ভিটামিন যুক্ত হাওয়া এবং জল
রমণীয় রমণীতে শুয়ে আছি সারাক্ষণ
এবং শত্রুর মুখে থুথু দিয়ে
বাঁচার আনন্দে হেঁটে যাই লেনিন সরণি।

উজ্জ্বল আঠারোর অভিষেকে পৃথিবীর সমস্ত শরীরে বেজে ওঠে উৎসব।

রাত্রির ছাউনির নীচে

□

শেষ লোকাল্ ট্রেনটি ছেড়ে গেলে,
এক ঝাঁক বিমুগ্ধ মানুষ
নেমে আসে পাহাড়তলির নিবিড়ে ।

রাত্রি অল্প অল্প করে ঢেকে দেয় সমস্ত শরীর
ঘরের মধ্যে ঘর সেই প্রাণভোমরা ঘরে অশরীরি ছিটকিনি খুলে
ঢুকে পড়ে বালক।

উথলে ওঠা ভাতের সুগন্ধে ভরাট গেরস্থালী মুহূর্ত
অতঃপর অন্তর্নিহিতে বাবার হাত ধরে অপুর এক একটা অবাক জন্মান্তর,
এইভাবে চলতে চলতে…
তারও পরে পাওয়ার ক্রমশই বাড়তে থাকে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তিনি তখন একা
প্রত্নতাত্ত্বিক রক্তাক্ত খননে উঠে আসে
দেশ, কাল, তাদের ঝলসানো মুখ।
কথা হয়, তাদের সঙ্গে কথা হয়
কথা হয়, তাদের সঙ্গে……
বয়ে যায় হু হু হাওয়া।

এইসব ভ্রাণ নিয়ে সম্রাট যোগাসনে বসে
এবং রাত্রির ছাউনীর নীচে বসতবাড়ি বানিয়ে
জন্ম জন্ম বাস করে মানুষ।

সুব্রত চেল

কাহিনী

□

ঠিক এই রকম একটা জীবন আমিও চেয়েছিলাম
আমিও দেখতে চেয়েছিলাম আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা
এত বছরের জীবনে আমি দেখতে চেয়েছিলাম
তার সঙ্গে আমার পার্থক্য
অনেক তো দৌড়াদৌড়ি অনেক তো ছোটাছুটি হলো
স্তিমিত হয়ে এলো আমাদের জীবনদীপ
স্তিমিত হয়ে এলো আমাদের পাড়াপড়শী
আর নয়
খুব চুপচাপ কেটে যাচ্ছে আমাদের দিন
খুব চুপচাপ কেটে যাচ্ছে আমাদের রাত
আমি কি ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম
তাও মনে পড়ে না এখন
এত বছরের জীবনে
আমিও কাগজে কলমে তৈরী করতে চেয়েছিলাম
আর একটা জীবন কাহিনী

শুভ বসু

হাতের একটি ভঙ্গীতে

□

চুমুর ইচ্ছে আলটে দিতেই তোমার ও হাত
গোধূলির উদ্বৃত্ত আলোর
স্তব্ধ মায়াকে গাঢ় নকসায় বুনে বুনে যায়, আর
আমার হৃদয় নম্র ধ্বনিতে বেজে ওঠে, খর হাওয়া
সে ধ্বনিগুলিকে আলগোছে তোলে, বয়ে নিয়ে যায়, খুব
যত্নে আবার মেলে দেয় সারা আকাশে, হঠাৎ
ত্রিভুবন জুড়ে জ্বলে ওঠে বহু হাজার হাজার তারা।

বিশ্বনাথ গড়াই

চতুর্দশপদী

□

যদি বলি, 'ভালো আছো?' আমার স্বপ্নের চেয়ে আরো
নিরুত্তর থাকে ছায়া, অনেক অনেক দূরে ম্লান
হলুদবাতির নিচে যেন তার পাঠমনস্কতা
টুক্‌রো হয় আচম্বিতে, কোমল চোখের ধারাজল
চিবুক ছোঁয়ার পরে ভাসিয়েছে অক্ষরবিন্যাস ;
বাড়ির পিছনে নদী, গম্ভীর গর্জন ভেঙেছিল
ত্রস্ত পাড়, বৃক্ষ, সিঁড়ি, আর ঘাটের ছলাৎ শব্দে
কেঁপেছে স্থদীপ শিখা, ধ্যানী ছায়া, বিহ্বল হৃদয় ;

আমার স্বপ্নের রং ততটা সবুজ নয়, দেখি
ঘোলা জলে ছিন্ন কেশ, আজ এই বিপন্ন বাতাসে
এলোমেলো ভেসে আসে রহস্যের কালো খড়কুটো ;
জলের অতল থেকে চূর্ণ স্রোতে ক্রুদ্ধ ঘাই ছায়
প্রত্নঝিনুকের খুলি, হাড়, ভাবি, এখনো বুঝিনি
অই দূর ফেরিঘাট, একা বাড়ি, তার জেগে থাকা……

বিমল দেব

ছিন্ন ডায়েরীর পাতা : ১৭

□

একজন ক্ষুধার্তকে নিয়ে কবিতা লিখবো আমার বহুদিনের ইচ্ছে। লেখা হয়ে ওঠেনি। তার আগ্রাসী খিদে আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। ঘুমে ঢলে পড়েছে আমার শরীর। আসলে—

ক্ষুধার্তকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়না
কেউ কেউ অবশ্য লিখে থাকেন
হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই
তাদের খিদে পায়না
কিংবা খিদে বস্তুটাই
তাদের কাছে মিষ্টিক চেতনা

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

হুস

□

পাহাড় বুঝেছে যে—সে জানে কাকে বলে বাধা,
কেমন পাখ্‌সাট খায় ঝড়।

তার কিছু নেই, অভিশাপ
অভিশাপ খুশী করে তাকে
বদলে সে তার যম—ডানায় এঁকে দেয়
আশিস-রেখা আর বলে আবার এসো।

দেহের ভেতরে তার পিঁপড়ের বাসা ভাঙছে রোজ
সে কেবল মজা দেখে, হুস্ করে উড়িয়ে দেয় ঝড়।

আশিস সান্যাল

জন্ম : ১৯৩৮
বৃত্তি : শিক্ষকতা (স্কুলে ও কলেজে)

কবিতার বই

শেষ অন্ধকার : প্রথম আলো
মৃত্যুদিন জন্মদিন
আজ বসন্ত
স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে
পটভূমি কম্পমান
জন্মে প্রতিজন্মে
জলপাই অরণ্যে প্রতিদিন (অনুবাদ)
আছি অন্ধকারে একা (যন্ত্রস্থ)

কবিতার সম্পাদিত বই

ষাটের কবিতা
সূর্যের প্রতিবেশী

আশিস সান্যালের নির্বাচিত কবিতা

বহুকাল বসে আছি

□

বহুকাল বসে আছি।
আরো বহুদিন
বসে থাকবো শব্দহীন বৃক্ষের স্বভাবে।

অস্থির কুটিল হাওয়া
যতোবার ছুটে
নিষ্ঠুর আঘাত হানে দাম্ভিক প্রভাবে,
ততোবার কেঁপে উঠে
অন্তরালে অবারিত পড়াসীর বন।

কিন্তু কি আশ্চর্য তবু—
প্রবীণ দুঃখের মতো বসে থাকি নিরুচ্চার।
সমুদ্র পাড়ের দেশে
যেমন গভীর রাতে প্রবল আঁধারে
তপস্যায় শান্ত সৌম্য
বসে থাকে দ্বিধাহীন শফেদার মতো স্থির অনিদ্র শ্রমণ।

বৃক্ষেরও বেদনা আছে,
ভাষা আছে,
প্রতিবাদ শুধু শব্দহীন।
প্রতিটি দুঃখের দিনে
নিজেকে সংহত করে
স্পর্ধিত হৃদয় তার মেলে ধরে স্থির দ্বিধাহীন।

রোদের কণিকা ক্রমে পান করে
দেহ করে ফুলে সুশোভিত,
ফুল ক্রমে ফল হয়—
জন্ম থেকে জন্মান্তরে এ জীবন হয় আবর্তিত।

বহুকাল বসে আছি,
আরো বহুদিন
বসে থাকবো শব্দহীন বৃক্ষের স্বভাবে।

রোদের কণিকা ক্রমে পান করে
প্রতিটি যৌবন থেকে ছিঁড়ে নেবো পুষ্পিত প্রণয়,
বেঁচে থাকবো বহুকাল—
বৃক্ষের স্বভাবে স্থির
বুকে রেখে চৈতন্যের স্পর্ধিত বিনয়।

রত্নার জন্য

□

প্রণয়ে উজ্জ্বল তুমি। দু'চোখের সংক্ষিপ্ত প্রান্তরে
শ্রাবণ মেঘের মতো রূপায়িত বিচূর্ণ করুণা।
ভ্রূ-ভঙ্গে আহত কর। প্রতিদিন আবির্ভূত যেমন বিজনে
সন্ধ্যার নীলিম বৃক্ষে নক্ষত্রের সজীব মহিমা

ধ্বনিময় উদ্ভাসিত—তেমনি হে রূপবতী তোমার আশ্বাসে
অফুরান বৃষ্টি নামে চোখে স্থির চোখ রাখি যেই ;
এমন নিভৃত বৃষ্টি যতদূর প্রতিভাত সময়-সংসার
যেন আর কোনোখানে পৃথিবীর কোনোদিকে নেই।

সন্ধ্যার বনভূমি

□

অদ্ভুত নিরালা এই বনভূমি
নির্জন জোছনা
যতদূর বিরাজিত সুনির্মল সবুজ পাহাড়।
হাওয়ার উজ্জ্বল ধ্বনি
জলের মতন দ্রুত উৎসারিত।

আমি পুনর্বার
দাঁড়ালাম মুখোমুখি তোমার সম্মুখে।

মুহূর্তে উড়াল চাঁদ
সুদূর বিজন,
ছুটে এসে শব্দহীন শুধালো আমাকে,
'কোথায় চলেছো বন্ধু?
কি চাও আমার কাছে স্বাধীন বিশ্বাসে?'

বললাম, ভালোবাসা।

সহসা মেঘের শব্দ ছড়ালো আকাশে।

মনে হলো শব্দ নয়—
পুনর্বার ক্লান্ত রক্তে যেন এক নবীন বিস্ময়
অকস্মাৎ আবির্ভূত।
তৃষ্ণার ভেতরে
যেন ফের শুভ্র পাখি উড়ে যায়।

তাদের ডানার শব্দ
শিউলি ঝরার মতো ছড়ায় ক্রমশঃ নীল বিস্তৃত নিখিলে।
মেঘে মেঘে শব্দ নয়—
আবার বেদনা ঝরে
প্রবল বৃষ্টির মতো পুনর্বার প্রবাহিত রক্তের তিমিরে।

এখন বৃষ্টির রাত

□

এখন বৃষ্টির রাত। অন্ধকার ঘরে বিছানায়
শুয়ে শুনি দ্রুত ভেসে যায়
হাওয়ায় হাওয়ায় দূর সমুদ্রের গাঢ় কণ্ঠস্বর।

আর কি উদ্দেশ্যহীন দেহের উপর
ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সরবতের মতো নীল গাঢ় অন্ধকার।

মনে হয়, তোমাকে পাবার
নিবিড় উৎসবে মত্ত আজ এই দৃশ্য পটভূমি।
প্রবল বৃষ্টির শব্দে ধ্বনি প্রতিধ্বনি
দ্বিধাহীন অনুরত। চতুর্দিকে স্বপ্নময় গাঢ় অন্ধকার—
এর আগে স্বাদ এর জানা কিছু ছিল না আমার।

সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে কাঁপে দীঘির মতন স্নিগ্ধ তোমার শরীর।
সর্বত্র দু'চোখ মেলে দেখি পৃথিবীর
অদ্ভুত লাবণ্যধারা প্রবাহিত শ্যামলে সুনীলে
এখন বৃষ্টির রাত। জলে
পূর্ণগর্ভা হরিণীর চোখের মতন
রূপে বর্ণে তুলনীয় মমতায় নীলিম বরণ
ছড়িয়েছে রূপ তার রূপবতী রাতের তিমিরে।

এ কোন্ কাঙ্ক্ষিত রাত? বৃষ্টির গভীরে
ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টির আদিম উৎস—গাঢ় অন্ধকার—
এ যেন ভূমিকা শুধু তোমাকে পাবার।

এখন বৃষ্টির রাত। অন্ধকার ঘরে বিছানায়
শুয়ে শুনি দ্রুত ভেসে যায়
হাওয়ায় হাওয়ায় দূর সমুদ্রের গাঢ় কণ্ঠস্বর।
এ কোন্ নবীন জন্ম। দেহের উপর
বিচূর্ণ মেঘের মতো প্রবাহিত নীল অন্ধকার
ধাবমান দিকে দিকে। আর অন্তহীন
বিজন বৃষ্টির বুকে নির্ধারিত এই অভিসার—
সৃজনের এত স্বাদ—এর আগে জানা কিছু ছিল না আমার।

একটি চতুর্দশপদী

□

তোমরা যখন খুশি চলে যেও। আমি এই প্রান্তরের তারা ভরা রাতে
আবছায়া নদীতীরে হিমে ভেজা চন্দ্রিমার ধ্বনিময় নির্জন আলোতে
দেখবো দু'চোখ মেলে মমতায় পরিপূর্ণা সেই সব আশ্চর্য মোহিনী,
শীর্ণা হীরার স্পর্শে কেমনে উজ্জ্বল করে ভাসমান শব্দের তরণী।
কেমনে পাহাড় পথে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে এক ঝাঁক শাবক চিত্রল,
মেটাতে প্রবল তৃষ্ণা পান করে দ্বিধাহীন স্বচ্ছতর বরফের জল—
অথবা দুর্লভ হাওয়া ছুঁয়ে যায় অভিসারে সারিবদ্ধ সুপুরির বন,
ভোরের বৃষ্টির মতো কেমনে দিগন্ত মেঘ শান্ত করে তাপদগ্ধ-মন।

তোমরা যখন খুশি চলে যেও। অন্য কোনও দূরবর্তী নগর দর্শনে
পুলকে ভরাও চিত্ত অফুরান ঐশ্বর্যের স্বাদহীন বিপুল বর্ষণে।
অথবা আরেক দৃশ্যে-জাগাও সহজ কোনও দিগন্তের প্রাদেশিক নাম—
তবু আমি ফিরবো না। এইখানে শব্দহীন আশ্বিনের তারা ভরা রাতে
দেখবো দু'চোখ মেলে কিশোরী চাঁদের এই নিরাময় নির্মল আলোতে
বহতা নদীর জলে আলো আর আঁধারের মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীন সংগ্রাম।

পটভূমি কম্পমান

□

এ কোন্ উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া? ছলাৎ ছল জলের প্রবাহ?
এ কোন্ দিগন্ত জুড়ে বিপুল বর্ষণ?
বিদ্যুৎ ন্যাবারে কোন ত্রস্ত বনস্থলী ভয়ানক আন্দোলিত?
মেঘে মেঘে ঘোষিত এখন
এ কোন চৈতন্যবাহী জলীয় ঝঞ্ঝার উদ্দাম উদ্ধত ধ্বনি?

হে ত্রিকালদর্শী সপ্তর্ষি আকাশ!
এ কোন্ দিনান্তে আমি নিপতিত?
যে দিকে তাকাই
শুধু ভাঙনের প্রতিধ্বনি।

আচ্ছাদিত অন্ধকারে চেয়ে দেখি আর
ক্ষয়িষ্ণু শৃগাল
কম্পমান মৃত্যুভয়ে।
গেরিলা মরুভূমী
দিকে দিকে নিনাদিত এ কোন প্রান্তরে?

কোনদিকে ফিরে যাবো তবে?
রক্তভয় মৃত্যুভয় থেকে
নন্দন কাননে কোন কুড়াবো বকুল?
গাঁথবো নিরভ্র মালা?
প্রেয়সীর ঘরে
শয্যায় ছড়াবো কোন প্রত্যাশায় বিস্তীর্ণ মুকুল?

কোনোদিকে পথ নেই।
ফিরবার
সমস্ত দুয়ার রুদ্ধ।
সর্বত্র ভীষণ
উত্তাল স্রোতের ধ্বনি।
বাতাস কামান
ভাঙবেই ব্যর্থতার দীর্ণ পটভূমি।

এক যুগ আলোকিত।
তারপর ক্ষণিক আঁধার
পুনর্বার জাগরণে সেই অন্ধকারে
আলোড়নে হেঁকে ওঠে প্রত্যাশী বিমান।
রক্তে পরিস্নাত হয় বসুন্ধরা।
গঞ্জে ও খামারে
আসন্ন জন্মের লগ্নে
কেঁপে ওঠে পটভূমি গর্ভিণী মাতার।

কম্পমান পটভূমি

কোনোদিকে আর
ফিরবার পথ নেই।
চতুর্দিকে অভিরত জলীয় ঝঞ্ঝার
ভয়াল বিপুল শব্দ।

ইতিহাস গর্জে ওঠে
রক্তে তার অবিরাম জেগে ওঠে ধ্বনি।
কোথাও বিদ্যুৎ ফোটে,
স্বাগত প্রথম রৌদ্রে
যেন তার উদ্ভাসিত শুনি প্রতিধ্বনি।

কোথায় বিদ্যুৎ ফোটে

□

কোথায় বিদ্যুৎ ফোটে ?
কোনখানে সূর্যোদয়ে পরিস্রুত এখন আকাশ ?
তরমুজের মতো স্নিগ্ধ
তৃষ্ণার ভেতরে
কোথায় আঁধার ছিঁড়ে
উড়ে যায় আলোড়নে শুভ্র সব দীপ্ত পাতিহাঁস ?

সেইখানে ফিরে যাবো
শীর্ণা সেই নদীতীরে অলথ নির্জনে,
যেখানে ভোরের হাওয়া
বিলের সংলগ্ন স্মৃতি ঠোঁটে করে স্তব্ধ বাঁশবনে
ছড়ায় নির্জন বৃষ্টি—
শ্রাবণ মেঘের মতো পরিপূর্ণা যেথায় মোহিনী
বুকের ভেতরে রুদ্র খরবায়ু
শান্ত করে অবিরাম প্রখর বর্ষণে
সেইখানে ফিরে যাবো
শীর্ণা সেই নদীতীরে অলথ নির্জনে।

এখন আরেক দৃশ্য।
ঋতু বদলের হাওয়া স্পষ্টতর দেবদারু গাছে,
শিশির ঝরার শব্দে
অন্য এক প্রতিধ্বনি দূর থেকে দূরে
ভেসে যায় ক্রমাগত।
তৃষ্ণার ভেতরে
অন্য মেঘ উড়ে যায় দীপ্ত অভিলাষে।

ট্রিওলেট

□

এক

স্বপ্নে তুমি ছুঁয়েছ অন্তর,
জাগরণে এইতো আমার সুখ।
রূপ-নগরে বেঁধেছি তাই ঘর,
হঠাৎ রাতে সরব যদি ঝড়—
রাখবো কোথায় ক্ষত বুকের দুখ ?
স্বপ্নে তুমি ছুঁয়েছো অন্তর
বুকে আমার রেখেছিলে বুক—
জাগরণে এইতো আমার সুখ।

দুই

ফল কি ফুলের চেয়ে দামী ?
প্রশ্ন করে ভ্রমর চঞ্চল—
আমি তো ফুলের অনুগামী।
চাইনা রঙীন স্বাদু ফল,
তৃষ্ণায় কেবলই খুঁজি জল—
ফল কি ফুলের চেয়ে দামী ?
চারদিকে ভোরের উজ্জ্বল—
আমিতো ফুলের অনুগামী।

আশিস সান্যাল

কবিতার উৎস

যে-কথা আমি কাউকে বলতে পারি না, না আমার প্রেমিকার কানে কানেও—সেই একান্ত গোপন কথাটি বলি আমি কবিতায়। কিন্তু কেমন করে বলি? কেন বলি? এর উত্তর আমি এখনও পাইনি। শুধু জানি, না-বলে আমি থাকতে পারিনা। না বলতে পারলে একটা দুর্বোধ্য বেদনা কেবলই মনের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। ক্রমাগত রক্ত-ক্ষরণ হতে থাকে বুকের মধ্যে।

এই বলতে যাওয়ার ইচ্ছে থেকেই জন্মলাভ করে আমার কবিতা। তাঁর মানে এই নয় যে, দৃশ্যমান বস্তু জগতের কাছে কোনও ঋণ নেই আমার। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কতোখানি, তা সঠিক বুঝতে পারিনা। বুঝতে পারিনা, সঠিক কি নিয়েছিলাম।

এই যে ক'দিন আগে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পেয়েছিলাম, বাসের তলায় পিষ্ট একটা মানুষের দেহ। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল বেদনায়। কি যেন একটা বলার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল। বাড়ি ফেরার পর সবাই যখন সামনে এসে দাঁড়াল, কিছুই বলতে পারলাম না তাদের। যা কিছু বলার বললাম কবিতায়। সেই কবিতাটি পড়ে বন্ধুরা বললেন, 'দারুণ প্রেমের কবিতা লিখেছ।' আমি ভাবলাম, এমন ভাবতো ছিলনা মনের কোথাও। তাহলে?

এর কারণ এখনও বুঝতে পারিনি। আসলে, আমার মনে হয়, কবিতায় হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা রয়েছে অনেকটা স্থান জুড়ে। শুধু কবিতা সম্বন্ধে নয়—যে-কোনও শিল্প সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। একই হাতে কতো প্রতিমাই তো গড়ছে কারিগর। কিন্তু কোনও একটা দারুণ হয়ে গেল। কারিগরও বুঝতে পারল না কেন। কবি তো লিখেই চলেছেন। অথচ একটি কবিতা তার অগোচরেই হয়ে উঠল আশ্চর্য সুন্দর।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, অনুশীলন প্রয়োজন নেই এর জন্যে। কারিগরকেও অর্জন করতে হয় প্রতিমা সম্পর্কিত জ্ঞান। কবিকে অর্জন করতে হয় শব্দ ও ছন্দের ধারণা। তবে শব্দ ও ছন্দ ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা থাকলেই সর্বদা রসোত্তীর্ণ হয় না। কখন হয়, কবিও তা জানেন না। কখন কবিতা যথার্থ কবিতা হবে, তা কবি বলে দিতে পারেন না আগে থেকে।

অন্তত: আমি তা পারি না। তাই দেখি, এমনও সময় যায় মাঝে মাঝে, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও একটি লাইনও লিখতে পারছি না। আবার এমনও সময় আসে, যখন একটার পর একটা কবিতা হয়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ কবিতার কারখানায় করার চেয়ে হওয়া ব্যাপারটারই প্রাধান্য বেশি।

সচেতনভাবে যেটুকু করি, তাহল কবিতার শরীর নির্মাণ—মানে শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি দান। আমার কবিতায় শব্দের ব্যবহার তাই কিছুটা বিচিত্র। অনেক সময়েই আমি শব্দের প্রচলিত অর্থ অস্বীকার করে নতুন ব্যঞ্জনা দেই। ফলে সোজা পথে চলতে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরা ধাক্কা খান। একজন সুন্দরী নারীকে নারী না বলে হয়তো কোনও গাছের নামে নাম দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইনা। আবার মাঝে মাঝে মনের তীব্র বেদনা যেন কবিতায় ঝড়ো-হাওয়ার মতো বেরিয়ে আসে।

এ-ভাবেই জন্ম হয় আমার কবিতার।

প্রকাশের অপেক্ষায়

Bengali Poetry Since Independence

সম্পাদনা—আশিস সান্যাল

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পালা বদলের মুখে

□

কালের ঘোলাটে দৃষ্টি চেতনার রোমে রোমে সংখ্যাহীন মৎকুনের বাসা,
শূন্যে ঝোলে যুগসন্ধি মস্তিষ্কের অলিগলি অবাঞ্ছিত যন্ত্রণায় ঠাসা
সহর গড়ার মুখে মনগুলো যেন আজ ভেঙে ফেলা পরিত্যক্ত বাসা।

বসন্ত বছর ঘুরে আসে কিন্তু আসে কই ফাগুনের সাহসিক হাওয়া ?
মর্গে প্রেম অপঘাতে নিহত গলিত শব পাশবিক সব চাওয়া পাওয়া
অধঃপাতে যেতে যেতে আশা-বৈতরণী বুকে থামেনা স্বপ্নের গান গাওয়া।

আঘাটা অকুল গাঙে শত শত ডিঙি নৌকা স্টীমারের জাহাজের ভিড়
ধুমবাষ্প উদ্গীরণী চোঙে কিম্বা মাস্তুলে কি গাঙশালিখ বাঁধে সুখনীড় ?
তান্ত্রিক যাদুস্পর্শে বিশ্ব প্রপঞ্চের স্বপ্ন অনাঙ্কিক গভীর নিবিড়।

বিদ্বেষবস্তু পুং বেশ্যা বৃত্তি ভোগে সুখন্বেষা বুকে নিয়ে খবুরে কাগজী
অহমের আস্ফালনে নির্লজ্জ ভাষণে বলে, 'গণতন্ত্রে মুক্তি কর্তা ভজি।'
সত্য আজ অভিমন্যু সাত মিথ্যা ঘিরে মারে লম্ফঝম্প দেখে আমরা মজি।

একদিকে মুষ্টিমেয় নাকগুলো বাড়তে বাড়তে শূন্য ফুঁড়ে সূর্য ছুঁতে চায়,
অন্যদিকে সংখ্যাহীন কঠিন পায়ের চাপে পৃথিবীর মাটি ফেটে যায়,
অনাত্মস্থ সংঘাতের সচেতন ইতিহাস কালান্তের সন্ধানে তাকায়।

পথে ঘাটে ঝাঁ ঝাঁ রোদ স্থিতচিত্তে শিল্পবোধ বুদ্ধি দীপ্ত ভাষার নির্মোকে
প্রগতির রূপ দিতে বারে বারে ব্যর্থ হয় সংহতির সোনালী আলোকে
বিষণ্ণ গাঙ্গেয় পলি প্রাণের শৈথিল্যে মূক বর্মশূন্য জীবনের শোকে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ছদ্মবেশী

□

তুমি যা দেখতে চাইছো না
সে-দৃশ্যই তোমাকে দেখতে হবে।
যা শুনতে মোটেই রাজী নও,
তাই শুনতে হবে ;
যা পড়বার আগ্রহ একেবারেই নেই
সেই অক্ষরগুলোই
তোমাকে দিয়ে পড়িয়ে নেয়া হবে।

এইভাবেই চলছিল কয়েকটা বছর।
বাইরে চাবুক হাতে বেড়িয়েছে রক্ষীবাহিনী,
যেন এইভাবেই চলবে দিনের পর দিন
সবাই বন্দী থেকে যাবে অনন্তকাল
যে যার খাঁচায়।

একদিন হঠাৎ বন্দী লোকগুলোর কানে
কে যেন ঢুকিয়ে দিল শৃঙ্খল ভাঙার মন্ত্র !
বারুদের মতো জ্বলে উঠলো সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছাশক্তি,
ধ্বসে পড়লো সিংহাসন।
মানুষগুলো খাঁচা ভেঙে বাইরে পা বাড়ালো।

আজ নতুন ক'রে শপথ নেবার পর
আড়াল থেকে কারা যেন আবার
কলকাঠি নাড়ছে,
নতুন খাঁচা বানাতে চায় !

আলোর ভিতরে বিষ,
শস্যের ভিতরে বিষ,
আকাঙ্ক্ষার ভিতরে বিষ ছড়িয়ে দেবার জন্যে
ইঁদুরগুলো গর্তের ভিতরে কি
অপেক্ষা করছে ?
এখন ছদ্মবেশীর মুখোস খুলে দেবার সময়॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

খোলামকুচি

□

ভালবাসার দাম দেবে কি ?
এর কি মূল্য হয় ?
অন্ধকারে খুঁজতে হীরে
জ্বালতে হলে আলো
জানবে সেটা আসল হীরে নয়।

ভালবাসার দাম দেবে কি
অমৃতময় যন্ত্রণাতে
প্রেম যে চিরশুচি,
দামের অতীত বলেই বোধহয়
মূল্য খোলামকুচি।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

মতামত

□

"ধর্মের মতো কবিতাও এক বিপুল ধাপ্পা"—বলেছেন
বিপ্লবী পোলিশ কবি তাদেউশ রুজেভিচ্ !
একদা কুলি এই কবি নিজের চেষ্টায় তারপর
ক্রমশঃ ভাষা ও বাক্যগঠনপ্রণালী অর্জন করে বুঝেছিলেন
ব্যালাড, কোমল ওড, নিসর্গের আয়ামবিক ছবি
—এ সবের চেয়ে অনেক প্রবল সত্য টাইমটেবিল, বার্থসার্টিফিকেট,
অর্থাৎ এ্যান্টিপোয়েমকেই এ যুগের প্রকৃত মানুষিক বিষয় বলে
রুজেভিচের মনে হ'ল !
তরুণ দারুণ তপ্ত কবিদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন
"হে অল্পবয়সী, তোমার যা খুশি তুমি লিখো
যে কোনো শৈলীতে, মিল বা অমিলে, শুধু মনে রেখো
এই গম্ভীর ব্রীজের নীচে বড়ো বেশি রক্ত বয়ে গেছে"

হায় কবি ! কিংবা কবিতার অর্থে কবি নও শুধু বিপ্লবী রুজেভিচ্,
তুমি কেন ক্ষমা করবে এই নটবর বোকা মায়া-সত্যতাকে,
কেন পড়বে সেই চশমা, যাতে
দুহাত দূরের বস্তুরই আকার শুধু বোঝা যায় !
চাঁদ ও তারার তত্ত্ব, গতি-নদী পরিত্যাগ করেও কেন ছন্দ দেখে
সাবধান হবেনা সংবাদপত্রশিক্ষিত সভ্যতা ?
কেন চেনা, বহমান, উপমা, উৎপ্রেক্ষা অন্তমিলের কবিতাকে
শেষবার বলবেনা চে গুয়েভারাও নারী ছিল
ছিল স্তন যোনি চুম্বন-আঁধার
অথচ রোজনামচায় কিছুই লিখলেন না ঐ সব কবি-আবিষ্কার !
তার বিপ্লব যত শ্রদ্ধাকে অর্জন করে
তার বনবাসী অক্ষর "কাল কি খাব, পরশু কি খাব
কে ধরা পড়ল, বা কে এখনো হয়তো পড়েনি"—এসবই
হয়ে থাকলো অতি সাধারণ দৈনিক স্বাক্ষর।

বিপ্লবের কাছে বারবার এসে হাত পেতে দাঁড়ায় মৃত্যু, সেখানে আরেক
মৃত ফুল, মালার গ্রন্থনা রেখে কি লাভ ! ঐ বাসী যিশুর পেরেকে
ঝুলে থাকা কাঁচের ফ্রেমের মতো চৌকো ইতিহাসকে এখন
পোড়াক সুলভ অগ্নি, দেবভাষা উচ্চারণ করুক ব্রাহ্মণ
কিন্তু নিখাদ, ন্যাংটো, টানটান সোজা রেখে যাওয়া শব্দরা এখন
ছন্দসমাপ্ত কবির মৃতদেহ সন্তাপের মতো পরিক্রমা করুক ;
কেননা মৃত্যু-পরবর্তী আত্মার মতো তারা ইতিমধ্যেই তো খানিকটা অচেনা
উষ্ণ নীল স্থিরতায় একাকী গিয়েছে উঠে
অগ্নি কিছুতেই আর তাদের ছুঁতে পারছেনা……

কৃষ্ণ ধর

আমার নিজস্ব দুঃখ

□

প্রশ্ন করো না আমার হৃদয়ে আর শোনো
দুঃখ আছে কিনা
নিজস্ব দুঃখ বলতে আর কিছু নেই আমার
আমার দুঃখ দক্ষিণ আফ্রিকার নিহত নিগ্রো বালকের
মায়ের চোখের জল
আমার দুঃখ বেলচিগ্রামের নিহতদের চিতার আগুন।
আমার নিজস্ব দুঃখের সঙ্গে জাতিসংঘের দুঃখও মিলেছে
আমি বাস্তুদের একজন হয়ে বেঁচে আছি।

আমি জানি মানুষের দুঃখের মিনার
অন্য এক তীব্রতর আগুনের মুখোমুখি হয়ে
ট্রাজিক মহিমার চূড়ো স্পর্শ করেছে।
আমার নিজস্ব দুঃখ তার কাছে অতি তুচ্ছ
পৃথিবীর সচ্ছলতা ছাপিয়ে উঠছে দুঃখের অগুণতি শিবির
তার গভীর বিষণ্ণ ছায়ায়
হৃদয়ের রক্তক্ষরণের সঙ্গে মিশে গেছে
অসহায় বন্দীদের আর্ত ক্রন্দন
নিজস্ব দুঃখ বলতে আর কিছু নেই আমার।

একটি ক্যানভাস

□

বিজয়ী অশ্বারোহীর মতো এসে
একদিন সে ঘাড়ে বয়ে এনে দিয়ে যায়
বিশাল ক্যানভাস।

শিল্পীর হাতের কাজ

দুরন্ত ব্রাশের টানে সবল সতেজ
রঙ যেন পাঁচ মুখে কথা বলতে চায়।

এ ঘরেই থেকে যায় শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি
স্বপ্ন, শ্রম, অনুভব, হৃদয়ের কথা।

অল্প স্বল্প রোদ এই ঘরে
দক্ষিণের হাওয়া এসে কখনো-সখনো
জানালায় লুকোচুরি খেলে।

শিল্পীর তুলির টানে
ফুটপাথ থেকে উঠে এসে
খিন্ন শীর্ণ ভুখা নরনারী বাসা নেয় দেয়ালে ক্যানভাসে।

সারাদিন ক্যানভাসের বুকের ওপর
অশ্বারোহী ছুটে যায় পুব থেকে পশ্চিম দুয়ারে
একা একা
বাউণ্ডুলে হাওয়া তার পিছু নেয় সকাল বিকেল।
দৃশ্যপট যেন বদলে যায় নিস্তব্ধ ঘুমন্ত রাতে
এই সব ক্ষুধাতুর নরনারী
ক্যানভাস থেকে নেমে বেমালুম ঢুকে যায় রান্নাঘরে
খাবারের খোঁজে।
টুং টাং শব্দ হয় থালা বাটি চামচের
ভাতের সুগন্ধ আসে!
নিঃশব্দে গোল হয়ে বসে ওরা খাওয়া সেরে নেয়
একটি কথাও বলে না
সকালে ঘুম ভাঙার আগে ফিরে যায় শিল্পীর ক্যানভাসে।
আরেকটু পরেই রোদ
দক্ষিণের হাওয়া।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়॥

ফণিভূষণ আচার্য

স্বীকার করছি

□

গত তিনমাস আমি একটিও কবিতা লিখিনি
গত তিনমাস যেন পৃথিবীর ডালে সূর্য ওঠেনি
কুঁড়ি ধরেনি ফুল ফোটেনি……
পঞ্চান্ন গ্রামের থাল সাঁতার প্রতিদিন
ভিজে কাপড়ে এক-একটি সকাল উঠে এসেছে কলকাতায়
বাতাস উঠেছে মাঝরাত্তিরে জংধরা জানলা দরজা কাঁপিয়ে

গত তিনমাস পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়

প্রতিশ্রুতি ছিল শহরের নিষিদ্ধ গোলাপের উদ্ধারের জন্যে
আমার ডানহাত একদিন উপহার দেবো
কোন অশ্রুতপূর্বার জন্যে বুক চিড়ে রক্ত ঢেলে দেবো
প্রতিশ্রুতি ছিল তোমার মুখ কখনো ভাববো না
জীবনে কোন কথাই আমি রাখতে পারিনি
না দুঃখে না আকাশে
এই এক দুর্বলতা নিয়েই আমার জন্ম
এবং নির্বাসন…

শুধু মূকবধির বিদ্যালয়ের আকাশে চাঁদ উঠলে
বুকের ভেতরটা আমার কেন জানি না
ভেঙে খান খান হয়ে যায়

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

রোদ উঠছে চলো যাই

প্রস্তুতির পথে

অমিতাভ দাশগুপ্ত-র দীর্ঘকবিতা

মৃত্যুর অধিক খেলা—প্রিয়তম খেলা

□

একটা মানুষ চাইল ভালোবাসতে।
তার হাতে
যাদুই রুমাল দিয়ে বলা হল :
অমুক তিথিতে
অমুক পাড়ায় তুমি অমুক গলির মোড়ে
অতটার সময় দাঁড়িয়ে
তিনবার ক্ল্যাপ দিয়ে নেড়ে দেবে তিনবার রুমাল,
তাহলেই—ব্যাস।

সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হলে
কয়েকটি দোকান খোলা থাকে,
সমস্ত জানলার আলো নিভে এলে
চেয়ে থাকে কয়েকটি জানলা,
সবাই ঘুমোলে জাগে
কখনোই নারী নয় কয়েকটি পুরুষ,
শ্মশানের সব ছাই চণ্ডালের কলসে নেভে না,
জন্মের ওপার থেকে হাওয়া এসে উস্কে দেয়
অভিশপ্ত চিতার অঙ্গার,
অশ্রু আর জল ঠিক এক নয়
তাই গ্রামারের ভুল হলেও অক্লেশে কবি
লেখে 'অশ্রুজল',
কেজো চারপাশ আর কাঠের মানুষে ঠাসা
কঠিন নিয়মে
বারবার ঢুকে যায় বজ্রকীট,
তারপর অবিরাম করাত টানার শব্দ
প্রকৃত অসুখী শুধু শোনে রাতদিন দিনরাত—
সে অসুখী কখনোই নারী নয়, দণ্ডিত পুরুষ।

একবার ভুল খেলা শুরু হলে
ক্রমাগত ভুল বাঁশি ভুল অফসাইড,
অথচ এখানে শুধু এখানেই
চিরছায়া। ছোটোবাড়ি
বৃষ্টি ঘিরে রাখে ;
জলে ভিজে সুখ পায় বশ্য ভালোবাসা।
ভালোবাসা মানে সেই বামপন্থা,
ভারতীয় ট্রেডমার্কা বিপ্লবী ভড়ং আর বুজরুকি নয়,
ফেরেলের সূত্র-অনুযায়ী
নির্ঘাৎ বাঁ-দিকে থাকে সাহাদের সমস্ত দোকান
প্রকৃত হৃদয় পার্টি,
লোহার মানুষ চাঁদ সদাগর
বাঁ হাতে দক্ষিণা দেয়,
কেন দেয়? সে-ও ভালোবাসা।

একটা মানুষ চাইছে ভালোবাসতে।
প্রেম নয় মাংস নয়,
বুকের অসহ ভার খসানোর
শরীরের চণ্ড জ্বর নামানোর
তার একটা ঠিকঠাক জায়গা দরকার।
এমন বিন্দুতে আজ মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছে
যেখানে বিকল্প নেই,
দিতে হবে তাকে দিতে হবে
খুব ছোটবেলা হতে তার কাছ থেকে
যা যা কেড়ে নেয়া হয়েছিল,
সুদে ও আসলে
পুরোটা উশুল করে দিতে হবে রাক্ষসী বেলায়।
একটু বিলম্ব হলে
অপেক্ষায় অপেক্ষায় নেকড়ে-প্রতিম সেই মানুষের রাগে
অগ্নিময় দশদিক—শুরু হবে খাণ্ডব দহন,

একসঙ্গে শব্দ তুলে
হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীর সমস্ত কার্পাশ।

আমার একজন বন্ধু একবার লিখেছিলেন,
'বড় শ্রমসাধ্য ভালোবাসা।'
সাত লক্ষ যুবতীর দলে কুল্যে জনাছয় নারী
হৃদয় জাগাতে পারে—এত পণ্ডশ্রম ভালোবাসা
বড় দুঃখময় রাতে আমাদের মনে হয় নাকি?

নাকি এত আশা করা ভুল?
একটি উন্মাদ, অন্ধ, হাড়সার কবি
যে-সব অদ্ভুত স্বপ্ন তুলে ধরে
কৃশ হাতে অঞ্জলির মত
তার কোনো মূল নেই কাণ্ড নেই ডাল পাতা?
মানুষের স-বিষ নিঃশ্বাসে
সেই স্বপ্ন উড়ে গেলে
কত ফোঁটা রক্ত পড়ে থাকে?
কবিতো অসুখী,
দুঃখী মানুষের নিরাময় হোক
তা সে চায় না কখনো।
বিশাল অলীক তরু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে
বুকের রক্তিম জলসেকে,
সে-তরুর ফুল নেই লতা নেই
শুধু কিছু বাজে পোড়া কোটর রয়েছে,
সে-কোটরে
কয়েকটি জন্মান্ধ সাপ পাশাপাশি থাকে,
এ-ওকে ছোবল হানে,
শিল্পের ছুতোয় ঢালে তীব্রতম বিষ,
করতল পেতে
সেই বিষ গণ্ডুষে গণ্ডুষে

লহমায় পান করে ভালোবাসা-কাতর মানুষ,
তারপরই শুরু হয় অবিস্মরণীয় খেলা—
শুরু হয়
ফুল ভেবে ফুলের বদলে
পথে পথে ফিরি করা হৃৎপিণ্ডের কর্কশ পাথর

সব ছলাকলা ছেড়ে শব্দের কুহক ছিঁড়ে
ডাকো, ওকে প্রিয় নামে ডাকো
ওর হাতে তুলে দাও
জলে ভিজে রোদ্দুরে ফুরিয়ে
একেবারে নষ্ট, শেষ হয়ে যাওয়া আকাঙ্ক্ষার ছাই,
মোহন মায়ার ছেঁড়া সুতোর মিনতি থাক
ওর কৃশ গোড়ালি জড়িয়ে ;
আসা ও যাওয়ার
সব ক'টি তরণী পুড়িয়ে
অগম পারের দিকে চলে যাক
যা পারো না দিতে—সেই ভালোবাসা খুঁজে মরা
কাঙাল মানুষ।
দূর হতে অতিদূর হতে
তার হাহাকার শুনে
আমাদের মনে হোক
এরই নাম প্রিয়তম গান।

মণীন্দ্র ঘটকের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস
শূন্যস্থান
সংহিতা :: ৬, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৫৩

সামসুল হক

চাঁদ দেখবো মা

□

গলায় ভারি পাথর বেঁধে চাঁদ ঐ আস্তে-আস্তে ধানক্ষেতের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে
শেষ-জবানবন্দি রাতপাখির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এতোক্ষণ হাওয়ায় উড়ছিলো
এখন সাপের খোলসের সঙ্গে মিশে গিয়ে শামুক ও গুগ্‌লির কঙ্কালের
মধ্যিখানে পড়ে আছে
এ-সময় দূরে একজন পাঁজর-ওঠা জ্যোৎস্না একটা ভিখিরি-বালককে
ডেকে উঠলো
খোকা ভাত খাবি আয়
গলায় ভারি পাথর বেঁধে চাঁদ ধানক্ষেতের সমুদ্রে ডুবে গেলো

আর জেলখানার ডায়েরির কবিতা থেকে কতোকগুলো 'কী' ছুটে এসে
ঝাঁপিয়ে পড়ে ধানক্ষেতের উপর
খুব দ্রুত গাঢ় করতে থাকে ধানের ঘোলাটে দুধ
ধানগাছের রঙের সঙ্গে মিশে থাকা সবুজ পোকাগুলোকে জান্তব ক্ষিধেয়
গিলতে থাকে ওরা
কিছুক্ষণ পরেই আবার ছয়ঋতু কাঁপিয়ে প্রস্ফুটিত হবে ঢং ঢং শব্দ
এ-সময় দূরে প্রতিমার মতো একজন মৃত্যু কাকে যেন ডেকে উঠলো
খোকা ভাত খাবি আয়
খুব দ্রুত গাঢ় হতে-হতে শক্ত হয়ে ওঠে ধানের ঘোলাটে দুধ

ফেরার সময় চাঁদের জবানবন্দির কাগজটা ওরা গভীর মমতাভরে কুড়িয়ে
নিয়ে যায়
দু-একজনের হাতে ভুলক্রমে সাপের দু-একটা খোলসও উঠে আসে

ভিখিরি বালক শেষরাত্রের স্বপ্নে ভাত খেতে খেতে বলে উঠলো
চাঁদ দেখবো মা

মতি মুখোপাধ্যায়

তুমি

□

তোমার হাতের কাঁটা পশমের জঙ্গলে সজারুর মতো ঢুকে পড়ে
জোয়ার লেগেছে বনে, মেঘভাঙা এইসব আষাঢ় দুপুরে
শান্তিনিকেতন মোড়া পেতে বসো বারান্দায়, দ্যাখো
শিমুলের কোন বীজ একা একা উড়ে যাচ্ছে দূরতম দ্বীপে
সে কী নোতুন পশম চায়, যেতে চায় মাটির গভীরে
নবীন কিশোর হ'তে? তুমি জানো এইসব গভীর লালন
বুকের গোপনে নিয়ে বেড়ে ওঠে গাছ, তার শাখা ও প্রশাখা
স্বপ্নের ভিতরে রোদে ছায়া দিতে, ফুল দিতে, কখনোবা ফল।

পশমের জঙ্গলে কোথায় যে এতদিন সেই বীজ ছিল
অবেলায় আজ তাই ভাবো, পুরনো পশম খুলে দ্যাখো
আলো তাপ বাতাসের কতোটা অভাব হ'লে অঙ্কুর আসেনা
কেনবা সে চলে যায় এতকাল পরে দূর অচেনার দিকে
চৈত্র পাতার মতো কেন খসে, খসে পড়ে কেন অভিমান
সে কোন কনিষ্ক যার মুণ্ড খোঁজো, কেন আজো ভেজে
পশমের রুখু মাটি, তোমার হাতের কাঁটা কেন তবে থামে?

প্রকৃত কবির মতো

□

রুখু দিনে মেঘ ছিঁড়ে গলগল করে বৃষ্টি নামলে
লোকটা বড়ো খুশী হয়, অথচ সে-ই
সেই লোকটাই কখনো চীৎকার করে বলে ওঠে
কে আছো ওখানে, রিপু কর অই মেঘের ছেঁদাটা
আমার ঘরদালান, জমি-জেরাত সব আজ যায়
আজ সব যেতে বসেছে সর্বনাশা বানে।

চার বিঘে জমির ওপর নাচানাচি করে সোনালী ফড়িং
নাকি লোকটার সুখ ও বিষাদ
আলপথে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সে দ্যাখে মেঘ
প্রকৃত কবির মতো সেই দ্যাখা, ভালোবাসা
কাজল মেঘের ফ্রেমে আদর্শ রচনার মতো তার
এই জীবন : গমে আর ধানে যেন নিটোল হলুদ।

তবু কোনদিন পঙ্গপালের মতো উড়ে আসে জল
জমি-জেরাত ঘরদালান উপড়ে নিয়ে মাইল মাইল
জলের ছুটে আসার মুখেও লোকটা কেমন অবিচল
ধরে থাকে মেঘ, ম্লান মুখে টানে মেঘের আঁচল
কবিতার সমূহ শব্দ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে যেমন
প্রকৃত কোন কবি দুঃখ পায়, তার
মানে সেই লোকটার হৃদয় তেমনি।

দীপক কর

হয়তো বাদ

□

তোমার কাছে যা ভালো মনে হয়
ভালো বলি কী করে তারে?
তোমার কাছে যা মন্দ মনে হয়
কী করে মন্দ বলি তারে?

আসলে তুমি ও আমি দুই ভিন্ন মেরুর অধিবাসী।

তুমি যখন বলো : হাতিটা ঠিক কুলোর মতো
আমি বলি : না, ওটা ঠিক থামের মতো।

জৈন দার্শনিক স্মিতহাস্যে বলেন : হয়তো! হয়তো!

শিশির গুহ

কেন

□

কাল রাতে শঙ্খিনী সাপের শব্দে
ঘুম ভেঙেছিল অকস্মাৎ ; চতুর্দিক অন্ধকার
দূরে জোনাকির চোখ জ্বলে এখানে-ওখানে।
গুলঞ্চলতার মত বুকের ভেতরে—
শিহরণ খেলে যায় রক্তের পাথারে।
রাতে আর ঘুমাতে পারিনি দীর্ঘক্ষণ
মাধবীলতার গন্ধ বারবার জানলায়
উঁকি দেয় ক্লান্তির আমেজে॥

রক্তের ভেতরে বুঝি শঙ্খিনীর শব্দ আছে?
তা না হোলে তুমি আমি ক্রমান্বয়ে ক্লীব কেন
শ্মশান ভূমিতে? কেন সত্য ক্রমশঃই নিম্নগামী?
জুজুর তাড়না বাজে সর্বক্ষণ বুকের ভেতরে।
বনস্পতি, উদার আকাশ, সমুদ্রের নীল
তোমরাও মানুষকে চিনে গেছ বুঝি?

গৌতম বাগচি

চলে এসেছি একা একা

□

মৌনমুখরে ডেকেছিলে তুমি
আমি চলে এসেছিলাম একা এবং একার মতন।
সংগে আনিনি কোনো চোরা অন্ধকার-অথবা
নিয়তিতাড়িত পাপ…
উন্মত্তপানীয়ও আনিনি,…তুমি বলেছিলে
সব পাওয়া যাবে এ শহর নেশা ও নারীর।
তোমার ডাক শুনে মায়ের দীর্ঘ সুখ ছেড়ে এলাম

রামধনু স্বপ্ন থেকে নিজেকে ছিনতাই কোরে
পরীর বাগান ছেড়ে চলে এলাম…।
আর এখন কিনা মাটি খুঁড়তে বলো
দেখাও চাঁদের তুফানমেলের স্বপ্ন…।
আমি এখন খাদ্য চাই প্রকৃত খিদের
বস্ত্র চাই দ্রৌপদীর মতো…চাই আকণ্ঠ নিমগ্ন নেশা,
তোমার ডাক শুনে আমি চলে এসেছি একা একা
হে পৃথিবী তুমি বলেছিলে অভাব হবে না
এ শহর নেশা ও নারীর।

কল্যাণ দত্ত

এখনো

□

এখনো যায়নি শীত,
যাবো যাবো করেও আঁকড়ে রয়েছে আমলকি ডাল।

সেই ভাবেই মনের পিঠে পিঠ দিয়ে
কিছু স্বপ্ন
উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের মতো এখনো রয়েছে দাঁড়িয়ে।
প্রখর রৌদ্রের তাপে গলে যাওয়া বরফের মতো
কিছু সুখ কিছুটা তৃপ্তি
হঠাৎ গিয়েছে থেমে বুকে।

তাইতো এখনো আমি কতো সহজেই
হেঁটে যেতে পারি বধ্যভূমিতে
হাতে তুলে নিতে পারি কবিতার বই॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

হাসপাতাল থেকে

□

১

কী যেন উদ্বেগে কাটে সারাদিন, কী যেন উদ্বেগে!

নীলিমা নামের নার্স গতকাল তিনবার জানতে চেয়েছিল,
বুকে কোনো কষ্ট হয়
বিকেলে কি সন্ধ্যেবেলা কিংবা বেশি রাত্তিরের দিকে?

আমার সময় হয়নি এইসব জানার টানার।
আমি তাকে বোঝাতে পারি না,
আমাকে ঘিরেছে নীল নয়নের ছায়া।

সে আমাকে ছুঁয়ে গেছে আজও তিনবার।

সে আমাকে কখনো বা বলে, ভেতরে আসুন তবে
ভেতরের ছবি তুলতে হবে।

তখনই সময় পাই তার দিকে ব্যক্তিগত চোখে তাকাবার।

২

আমি তাকে যত বলি, 'চাইনে চাইনে'—
সে তত এগিয়ে আসে ইন্দ্রাণীর মতো,
তসবির বাড়িয়ে বলে, 'তসবিরের মালিকানা নে।'

'এই রইল জাদুকরী চাবি।
তোরঙ্গ খুলিস একা অলৌকিক রাত্রির তিমিরে,

তোরঙ্গ খুললেই তুই
জাদুকরী দিন ফিরে পাবি।'

'কি হবে এসব দিয়ে?' আমি বলি,
'এবার গহীনে চলে আয়।'
পায়ের মলের শব্দ, ঝুমঝুম,
দূরে চলে যায়।

৩

আমি তাকে চিঠি দিই
রোজ রোজ, নীল খামে, ডাকে।
একটারও উত্তর কিন্তু
সে কখনো দেয় না আমাকে।

৬

দুঃসহ দিন বয়ে যাচ্ছে করুণ সমারোহে,
ঝিরঝিরিয়ে দুঃখ যেন বাঁশের পাতা কাঁপে
অসহ্য নীল বুকের ভেতর একলা পরিতাপে।

না-জানা শোক বক্ষে নিয়ে হঠাৎ কাঁদব ভাবি,
তখন হৃদয় উথলে ওঠে জ্যোৎস্নারাতের মতো।
কোনখানে যে ফেলে এলুম দুয়ার খোলার চাবি'—
ভাবতে ভাবতে অতল স্মৃতির তলায় ডুবতে থাকি।

৮

মন-খারাপের মেঘ ইদানীং জমা হয় কোম্পানী বাগানে,
সহসা শৈশব ফিরে আসে, অফিস যাত্রার কালে
ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে যদি, ট্রামবাস থমকে যায়
ফ্রিজশটে, পার্কের কিনারে লুকোচুরি, সবুজ ঝাঁকায় ফল,

লবঞ্চুস, হজমিগুলি—ফেরিঅলা হাঁকে,
শনপাপড়ি, আঁশফল চাই খোকাবাবু ?

ডান হাত বাড়িয়ে দিই সুদূর অভ্যাসে,
পুনরায় লজ্জা পেয়ে জামার পকেটে পুরে ফেলি।
কী যে হয় মাঝে মাঝে, কী যে খুঁজি নিজেই জানি না।
সর্বত্র ট্রাফিক জ্যাম, মেঘময়, চতুর্দিক ঝাপসা মনে হয়।

চতুর্দিক ঝাপসা ঝাপসা, হিসেবনিকেশে গরমিল।
সহসা দূরের মেঘ উড়ে আসে অতিদূর অন্ধকার থেকে,
অসুস্থতা বেড়ে যায়, বেড়ে যেতে থাকে,
অসুস্থতা নিশিপাওয়া মানুষের মতো।

১০

'তোমাকে এসেছি দেখতে।' আমি বলি,
'কী তোমার গোপন অসুখ !'
পারে না কিছুই বলতে,
সে দেখায় শুধু তার বুক।

'দ্যাখো, দ্যাখো, বুকের ভেতরে গাঢ় নীল !'
আমি দেখি, রাত্রির আকাশ যেন
আকাশের সঙ্গে কিছু মিল।

আর সব লণ্ডভণ্ড, দেখি নয়-ছয়।

'আছি এ অসুখ নিয়ে, বেশ আছি'—সে বলে আমাকে,
'হাসপাতাল বড় হয় পাখিদের ডাকে,
এখন অসুখ থেকে চাই না নিরাময়।'

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

আতান্তর

□

বাদাম ওড়েনা ঝড় বড় ঝড় অস্থির সায়র
পান্সি নৌকায় আমি বৈঠা টানি সঙ্গী নেই
আজ পর্দাঢাকা কূলকিনারা ধূসর কোনখানে কি জানি।

দাঁড়িয়ে আছ চন্দ্রাবতী নীলগঞ্জের অচিন্ত্যপুর ঘাটে
এতক্ষণে চক্ষের কোনে পানি আমি জানি…
আর কতদূর অচিন্ত্যপুর
টলমল করছে নৌকা অথৈ জলে কেমন আতান্তর।

তুমি কি হারিয়ে গেছ চন্দ্রাবতী, ফুরিয়ে গেছে
রামায়ণী শোলক কথা গান ? ঢেউএর পাঁজর
ভাঙছি আমি, গহিন নদী অকূল প্রান্তর।

সংহিতা সাহিত্য প্রকাশনীর প্রকাশ তালিকা

ছোটোর ছড়া বড়োর ছড়া। ৬·০০
অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্রৌপদী। ৮·০০
রামশঙ্কর ঘোষাল

বাংলা কবিতার স্বরলিপি (যন্ত্রস্থ)
প্রফুল্লকুমার দত্ত

সংহিতা : ৬, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৫৩

মণীন্দ্র ঘটক

সবিনয় নিবেদন

□

প্রচণ্ড খরার তোড়েই বা
হৃদয়-ট্রেদয় কার কোথায় ছিটকে ছড়িয়ে ছিল
কে কার খোঁজ রাখে, কে কার হিসেব!

এখন বর্ষা নামছে। গভীর রাত, অবিরল ঝিঁ ঝিঁ।
আমাদের এই কলকাতা কেমন নেয়ে উঠে
আদুল গায়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন, আর সিক্ত জ্যোৎস্না তার জঙ্ঘায়,
তার বুকে। আমরা সবাই এখন বড় প্রয়োজন ভেবে
হাতড়ে হাতড়ে যে যার হৃদয় খুঁজতে বিচলিত।
খরার সময় কে কোথায় যে স্ব স্ব হৃদয় ছুঁড়েছিলাম!
এখন বর্ষা, বোধগুলো সমবেত হচ্ছে।
কোথায় রাখবো তাদের? বড্ড ভয়।

মহাশয়গণ! আসুন, এই বর্ষার জ্যোৎস্নায়
আমরা স্ব স্ব হৃদয় অন্বেষণ করতে কিছুটা সিক্ত হই।
আসুন, মেঘেরা আকালী ব্রহ্মকালী হবেই,
সম্ভব হলে রথের মেলা বা এক ঝাঁক মুনিয়া
পাখির স্মৃতি বুকে করে আসুন, কাদা টপকে যাই॥

শিশির

□

অসম্ভব। সকালে উজ্জ্বল রোদে
কিছুতেই ভাবা যায় নাকো
সারারাত স্তব্ধ বেদনা
নিটোল ফোঁটায় জমে দিশেহারা করে।

অসম্ভব। সকালে জানালা খুলে
মনে রাখা যায় না তেমন
সারারাত কি করে কেঁদেছি,
বুকের গভীর থেকে বাষ্প উঠে কি করে কাঁদায়॥

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

স্কেচ ৬

□

ভোরের অস্বচ্ছ নদী, নদী, নাকি গাঢ় বিষাদ কারও
তীরের পাথর মৌন, কোথায় আঘাত, আদর বন্য জলোচ্ছ্বাসের

সবুজ পাহাড় দূরের, করুণ কুয়াশার ঐ চাদর নিচ্ছে টেনে
আকাশ ছন্নছাড়া, ছড়ায় দুঃখ, ছড়ায় বিবর্ণতা তারও

একি উচ্ছলতা রে তোর, কিশোরী, তুই সমস্ত যাস্ ভেঙ্গে
মহুয়া ফুলে গন্ধ কি তুই, তুই-ই কি প্রাণ আগুন-চৈত্রমাসের।

স্কেচ ৯

□

দামোদর পার হয়ে হেঁটে যাও, বৈরাগী, ওপারের জনপদ গ্রাম
আরও বেশী গৈরিক, বাতাস কি উদাস অধিক?

স্বজনবিহীন পথে ক্লান্ত কি, গার্হস্থ্য ছায়া বুঝি মেখে নেয় আবার শরীর
বধূর চোখেতে চোখ, আঙ্গিনায় নেমে ডাকা শিশুটির নাম?

ধোঁয়াটে অতীতে তুমি ফিরে যাও, জল ভেঙ্গে হেঁটে যাও ধীর
ভিজে যায় আলখাল্লা, ভেজেনি হৃদয়, জানো ঠিক?

স্কেচ ১২

□

উপচে পড়ছে জ্যোৎস্না চাঁদ থেকে, পরিপূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নায়
ভেসে যায় পৃথিবীর মাঠঘাট ত্রাসহীন মুগ্ধতায় ভাসা

বৃক্ষের অন্ধকারে তুমি, বক্ষলগ্ন তোমার রমণী
তোমরাও ভেসে যাও প্রণয়ের গভীর আশ্লেষে ;

আকাশের বন্যার, তোমার কি, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা
না কি, এই জ্যোৎস্নার পূর্ণতায় শর্তহীন মেশে ?

শ্রীকুমার চক্রবর্তী

পরাগলিপ্ত

□

অস্তিত্বের সর্বস্ব খেয়েছে ভিতরে বাহিরে, এ-প্রকৃতি—সময়ের অদ্ভুত নিয়মে,
আমি একা পড়ে আছি—পরবাসে পরাক্রান্ত, শকুনির হাতে
অদ্ভুত পাশার দান আমাকে ছোঁয় না, বিদ্ধ করে স্বভাববশত
কখনও-বা স্বপ্নকে অতিক্রম করে পড়ে থাকি বিরহ-শাসিত
মাঝে মাঝে স্মৃতির আঁশটে স্বাদ পাই—বহুদূরে
একাকী পরাগলিপ্ত তুমি, গর্ভবতী তোমার জরায়ু—
এই শীত ছিল বুঝি কুয়াশার পেটে, নিঃশর্ত অনুগামী
তুমি আগামী ঋতুর জন্য উল বুনে যাও

স্বপ্নের ভ্রূণগুলি ক্রমে ভেসে যায়, যোগাযোগ হয় ক্ষণকাল
স্মৃতি থেকে ঘ্রাণ ভেসে আসে, ফুটে ওঠে ব্যবহৃত অতীতের মুখ
অন্য এক গোপন শিবিরে পরিণত হতে থাকে ভ্রূণ যথাযত
একদিন সমস্তই ফিরে পাওয়া যাবে, হৃদয়ের অজস্র ক্ষরণে
ভালবাসা পরাগলিপ্ত লাল বন মোরগের ছবি এঁকে দেবে
সেইদিন আগামী শিশুটি হেসে উঠবে প্রজন্মের বধ্যভূমিতে !

সলিল লাহিড়ী

আধুনিক শহর কলকাতায়

□

এই শহর কলকাতায়—যা চাও তাই পাবে।
বাঘের দুধ, গণ্ডারের মাথার খড়্গ, তিমিঙ্গিলের চামড়া।
ভুল ইংরাজী বুকনিওয়ালা পালিস করা ছেলেমেয়ে, এখানে
সভ্যতার স্তম্ভ হয়ে যেন জ্বলজ্বল করছে।
পঞ্চাশ বছরের যুবতী মেয়ে আর ষাট বছরের যুবা,
সবই আছে এই শহর কলকাতায়।
মেকী দুঃখ, পালিসি সভ্যতা,
এয়ারকণ্ডিশনি দার্জিলিং হাওয়া, সবই আছে—
এই আধুনিক শহর কলকাতায়।
অভাব শুধু সামান্য কিছু, শুধুমাত্র কিছু কিছু মানুষ।
কিছু কিছু সত্যিকার মানুষ—
এরা বড়ই দুর্লভ
এই শহরে এরা অত্যন্ত প্রয়োজনহীন
এই দুর্দান্ত শহরে এরা নিতান্তই বেমানান।

আজকের মানুষের ছবি

□

এমন কিছু কিছু মানুষ আমি দেখতে পাই
যারা মৃত্যুর পরও ছবি হয়ে বাঁচে আমাদের মনে।
সেই সব মানুষের মূর্তি—কি জানি কেমন করে—
হঠাৎ একাকার হয়ে যায় ভগবানের ছবির সংগে।
আমি তাই আর কোনো ভগবানকে খুঁজতে মন্দিরে যাই না।
কিছু কিছু ঐসব মানুষের ছবিই আমার ভগবান॥

কিছু কিছু মানুষের মিল পাই আমি
চিড়িয়াখানার জানোয়ারদের সংগে।

মানুষের চামড়ায়—এক একটা মাংসাশী বাঘ,
হুবহু একটা মানুষের মত চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়।
আমি তাই বাঘ, সিংহ ভালুক বা নেকড়ে,
এইসব জানোয়ার দেখার জন্য চিড়িয়াখানায় যাই না
কিছু কিছু ঐসব মানুষের ছবি, আমার কাছে
জানোয়ারের চেয়েও অনেক ভয়ানক।

কিছু ভগবান আর কিছু জানোয়ার—
এই দুই পাশাপাশি চেহারায় আমাদের আজকের পৃথিবী।

রক্ত ঝরতে দাও

□

যদি রক্ত ঝরে, ঝরুক, ঝরতে দাও।
রক্ত ঝরেই মাটির রঙ বদলায়।
রক্তের আলিঙ্গনেই মাটির কোরকে জীবন জাগে,
পত্রান্তর নূতন যৌবনের উদ্গম তখন অনিবার্য্য।
বন্ধ্যা মাটির কান্নায় রক্তের লবন যখন মেশে,
তখনই নবজীবন আসে।
তাই রক্ত যদি ঝরে, ঝরুক, ঝরতে দাও।
রক্ত ঝরেই মাটির রঙ বদলায়॥

যুগের ম্যাজিক

□

এ যাবৎ বেঁচে আছি,—
অসম্ভব—অলীকের কিছু কিছু
আশা—স্বপ্ন নিয়ে।
এ তাবৎ বেঁচে আছি,—
বাঁচার নিগূঢ় কলকাঠি নেড়ে।
হাহাকার বুক চিরে, ধ্বনিময় হয়ে,

আশেপাশে তোমাকে—কাউকে,
বেদনার সঙ্গে নিয়ে নেব
এই আশা এখন করি না।
তবু বাঁচি বাঁচতেই হয়
ছলে-বলে—অথবা কৌশলে।
এ যুগে বাঁচাটাই—দুরন্ত ম্যাজিক

সত্য গুহ

অর্জ্জুনের দাহ

□

দশমাস দশদিনের মতন পোয়াতী
জল ধরে রাখতে পারছে না যেন মেঘ
বিদ্যুৎ চমক আর হাজার হাজার
আরণ্যক জন্তু-জানোয়ার রেগে গড়গড় করে যায় যেন

কুরুক্ষেত্রে মধ্য অষ্ট বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি তীরপাত
মনের ভেতরে চলছে দুর্জয় সংঘাত নানা 'হাঁ' এবং 'না'-এ
তুমি কারো জমি কারো চষাক্ষেত কারো
উদাসীন অধিকারে অথবা তোমার ধান অন্য মালিকের

এমনি কত কথা, তবু তুমি হে আমার সব যুদ্ধের প্রেরণা
নেই প্রসন্নতা, হায়, কোনো বীরত্বে ও জয়ে
আমার সকল ইচ্ছা কেবল তোমাকে লক্ষ্য করে

বৃষ্টি পড়ে, স্মৃতি ওঠে তেমন বুদ্বুদ জলে জলে
কুন্তীর বন্টন-পীড়িতা, আহা, তুমি কি এখন করতলে
মাথার উৎপন্ন চুল ছাড়া দিয়ে পাথর প্রতিমা বা অগ্নিবক্ষ শ্রাবণ আকাশ

অর্জুন রক্তাক্ত আত্ম-গ্লানিতে কর্ণেরও বুকে মৃত্যুবাণ হেনে॥

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মাস্ত্র

□

হাওয়া এক প্রবল ধাক্কায় হেলিয়ে দিল রাজতন্ত্র
আর তখন হিসাবী এবং বুদ্ধিমান রাজা ভেঙ্গে দিলেন রাজধানী,
ডেকে পাঠালেন পাঁচ পুত্রকে ;
বললেন :

"তুমি যাও বাম পথ ধরে,
তুমি যাও দক্ষিণ পথ ধরে,
তুমি আর তুমি সঙ্গী হও দুজনের ;
এবং তুমি অপদার্থ অতি, অতএব নিরপেক্ষ থাকো কিছুকাল
যতদিন না ওঠে ঝড়, বৃষ্টি, প্লাবন, কম্পন।"

পিত্রাদেশ !
শিরোধার্য, অনিবার্য এবং কঠোর
অতএব পুত্ররা নত শিরে রইলেন দাঁড়িয়ে,
আশীর্বাদ করলেন পিতা :
'সিদ্ধি লাভ হোক !'

নিতান্তই দীন বেশ এবং বিনয়ী পুত্ররা বুঝলেন দায়িত্ব তাদের
অস্ত্র ভিক্ষা করলেন তারা।
মুচকি হেসে বললেন রাজা :
'অস্ত্র চাও হা পুত্র আমার !
তরবারি ভেঙ্গে গেছে সময়ের দম্‌কা হাওয়ায়।'

বিষণ্ণ হয়ে রইলেন পুত্ররা
কারণ—পথ অতি দুর্গম
সমস্যা নেকড়ের মত আঁচড়াচ্ছে মাটি,
দুঃখ ভাল্লুকের মত গুঁকছে অন্ধকার।

বিষণ্ণ এবং চিন্তিত দেখে রাজপুত্রদের
বৃদ্ধ মন্ত্রী একটি করে আংটি পরিয়ে দিলেন সবার আঙুলে
বললেন কানে কানে :
'এর নাম বিভ্রান্তি,
ব্রহ্মাস্ত্র এটি ;
এই অস্ত্রে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, ধুরন্ধর
সবাই ঘায়েল।
বিশেষতঃ
অভাব যখন কায়েম হয়ে আছে শিরদাঁড়ায়
ততক্ষণ কোন ভয় নেই ;
যতদিন থাকবে অভাব
ততদিন অক্ষত থাকবে তোমরা
এবং নেপথ্যে আমি।'

আশ্বিনের চিঠি

□

আশ্বিনের ডাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে মেঘ
দুঃখের পালক দিয়ে লিখেছে বাঁকিয়ে—
'আগামীকাল নোঙ্গর করবে
এক যুদ্ধের জাহাজ
যার মাস্তুলে থাকবে
বিষের এবং অমৃতের পতাকা।'

অতএব গুণগুণিয়ে কাজ করার সময় এখন
কারণ কাজ একটা যুদ্ধ ছাড়া কিচ্ছু নয়,
যে যুদ্ধ যুদ্ধের বীজগুলো নষ্ট করে দেয়।

জয়া রায়

কল্পনা : ২

□

উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে জ্বলে বেশ ক্ষীণ
শেষ রাত দ্রুত গোণে মৃত্যুর প্রহর,
আকাশ কন্যারা সমুদ্রের তীরে ক্লান্ত লীন
গাছপালা জেগে ওঠে,
এখুনিই শেষ হবে রাত

সমুদ্রগন্ধা মাটির মতো দুঃখের ঘ্রাণ নিতে
কত সুখ পোষে বুকের ভিতর
পৃথিবীর মৃত বালিহাঁস
কিছু শব্দ ছিন্ন মেঘ উড়ে যায়
যেখানে কবিতা স্বদেশ
কিছু রোদ ঝরে ক্ষীণ হয়ে আসে শেষ দিন

আরও পরে নক্ষত্রেরা আসে
জ্বলে ওঠে আশা
নাকের বেশর দোলে সন্ধ্যামালতীর প্রাণে
এই তো প্রাণের গতি, বিগ্রহের মতো
সারাদিন ধূপ দীপ পুষ্পরাগে
সন্ধ্যাকালে খুঁজে যায় জলের বাসর।

উদয়ন ভট্টাচার্য

এই সময়

□

এইবার আমাদের শরীর জুড়ে জেগে উঠছে
সত্তা এবং পানীয়
কোথায় আছো হে
মাঝি তার আকুল ঝঞ্ঝায় যেন বিপদজ্ঞাপক এক নিঃশ্বাস নেয়

সে কি
সত্যিই মাঝি না কি
লৌকিক মানুষ
তার দৈব অসীম শূন্যতা নিয়ে
প্রার্থনায় বসে যায়

এসে যায় শীত
প্রকৃতির পরিবর্তনে আমরা মুহ্যমান
যেভাবে আমরা বেঁচে আছি
ভালো নেই, আমরা
স্রোত এলে ভেসে যাবো
মনে রেখো আজই দিতে হবে বাঁধ

কোথায় আছো হে, জাগো
ব্যাপ্ত বিশৃঙ্খল সমুদ্র তীর জুড়ে
অনন্তকাল এই প্রশ্ন জেগে ওঠে।

শ্যামল বসু

মধ্যযাম

□

কোন রঙ নেই চেনার যা আমার শৈশবের মত
অহরহ তাড়িয়ে নিয়েছে তার
নিজস্ব নিশানায় ;

দ্রুতগামী অশ্বের খুড়ে ওড়ে ধুলো
নির্বাসনের সঙ্গী আকাশ যা কেবল দুপুর চেনায়
জমে থাকা পরিচিত বিশ্বাসের মত।

তীর্থের রঙ থাকে না জানা, শুধু নাম কিংবা অবয়ব
বিষয়ানুগ স্থির চিত্রে-চলচ্চিত্র সব একাকার।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

যদি কোনোদিন

□

যদি কোনদিন দিগন্তের উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি
আমি তোমাদের সব হিসেব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে যাবো।
মেঘবরণ কাশফুলের মতো আঙুলে ক্যারম খেলা দেখেছি জানলার বাইরে থেকে
চোখ তুলে নিঃশব্দে কতোদিন বলতে চেয়েছি,
শুধু একবার তোমরা আমাকে খেলতে নাও
দেখেও দেখেনি তারা কোনোদিন।
গোয়াল ঘরের পেছনে পোষা কুকুরের গলায় মুখ রেখে অস্ফুটে বলেছি
দেখিস লালু, যদি কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি...

ছাব্বিশ বছরে একবারও দেখিনি মা কখন ঘুমুতে যায় ঘুম থেকে কখনইবা ওঠে
তার কোন উৎসব নেই, পা ছড়িয়ে বিকেলের গল্পগাছা নেই
বন্ধক রাখা টুকরো আংটির সুদের জন্যে স্বর্ণকার যা নয় তাই বলে গেছে মাকে
ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে এই সব শুনেছি কতোবার
দাঁতে দাঁত চেপে বলেছি, যদি কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি
দেখো মা, তোমার অসম্মান আমি কড়ায় গণ্ডায়...

অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছি, এদিকে এসো না কেউ অন্যদিকে যাও
প্রতিদানে অর্গল বন্ধ, আমাকে বাইরে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে সেইসব মানুষ
যাদের জন্যে অখ্যাত পথের পাশে হেলায় ফেলে এসেছি আমার দিন-মাস বছর
একবারও কেউ ডেকে বলেনি, তুমি আমাদের পর নও
অন্ধকার আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি ; মায়ের সাথে দেখা করতে দেয়নি
উৎসবের বিকেলে ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে অভুক্ত আমি দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি
ডিং ডিং শব্দ করে ম্লান আলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে ক্লান্ত মালগাড়ি।

নারীর সামনে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে ফেলেছি শরীর
ঘামের কপালে স্থির শিশির বিন্দুর মতো ভালোবাসা বুঝতে চেয়েছি।
অস্থির সন্ধ্যায় আমাকে বারান্দায় বসিয়ে

সে ঘুরে এসেছে রেস্টুরেন্ট, পার্কের অচেনা অন্ধকার।
তার সামনে দাঁড়িয়ে কতোবার বলতে চেয়েছি, আমি ভালোবাসি,
হায়! ওষ্ঠ কম্পনের শব্দে নারী এখনো ভালোবাসা বুঝতে শেখেনি।

তোমাদের অনাদর অবজ্ঞার ডানার ঝাপটায়
মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি প্রিয় ছাব্বিশ বছর,
যদি কোনোদিন দিগন্তের উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি
আমি তোমাদের সব হিসেব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে যাবো।

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

মনে হয়

□

একেকদিন মনে হয়
বুঝি কেউ এলেই ঠিক তক্ষুণি
প্লাষ্টিকের ফুলগুলি ফুলদানিতে
ফুটে উঠবে স্বাভাবিক বর্ণে গন্ধে তাজা
মনে হয় তৎক্ষণাৎ
দেওয়ালে কৃষ্ণনগরের পাতিহাঁস উড়ে যাবে
আকাশের আলোয় আলোয়

মনে হয় একবার যদি আর একবার কেউ আসে
মানচিত্রে নদী-নালা ফুলে ফেঁপে উঠবে নীল জলোচ্ছ্বাসে
এমনকি ক্যালেণ্ডারে কদম্বের বন
ছটফটিয়ে কথা বলবে আষাঢ়ের মেঘের ছায়ায়

মনে হয় যদি একবার
শুধু একটিবার কেউ আরো আসে
বাঁকুড়ার কালো ঘোড়া শিল্পের মধ্যে থেকে মুহূর্তেই
উঠে এসে মহাতেজে ছুটে যাবে যুদ্ধের ভিতর
মনে হয় সে এসে কাছে দাঁড়ালেই
আমার অসুখ সেরে যাবে

শুভাশিস্ গোস্বামী

এখন অন্ধকার

□

পথ চলি, চলিরে ভাই ঝুপসি আন্ধারে,
বুঝিনা কে বামে হাঁটে, কেই বা ডান ধারে।

দু'চোখ থেকেও নাই, আন্ধারে অন্ধ,
কোথায় মসৃণ পথ, কোথায় বা খন্দ
ঠাহর হয়না ভালো, মনে লাগে ধন্দ
আন্ধার-দরোজা খোলা, আর সব বন্ধ।

এখন চান্দিক জুড়ে বিজলী-ছাঁটাই,
নাচেরে নাচেরে কারা হাফ-আখড়াই।

আন্ধারে ঈশ্বরচন্দ্র ধরাশায়ী হন,
স্রষ্টা আর কেউ নয়, তাঁহারই ভুবন,
ইচ্ছা হয় একবার দেখা ক'রে আসি
কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে ভুবনের মাসি॥

দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর বৃত্তে তো

□

নরম নরম তৃণ টিয়ারং পাতার সবুজে
শিলাঙ্গী কুমারী নারী দিয়েছিল উত্তাপের খোঁজ
দীঘল চোখের তারা প্রশ্নময় আকাশের কোণে
খড়কুটো নিয়ে পাখী, সজারু তিতির
বড় বেশী ব্যস্ততায় হয়েছে সজাগ—

সেই থেকে বার বার বানিয়েছি ঘর
সেই ঘর ভেঙ্গে গেছে অন্যতর ভাবে।

কৃষ্ণসাধন নন্দী

এক একটা দিনে

□

এক একটা দিনে ঘুম থেকে ওঠার পর জিহ্বা টক রসে ভরে
সারা শরীর জুড়ে নেমে আসে বিষণ্ণ কান্না
হাত পা অবশ, তিরিক্ষে মেজাজ সপ্তমে
জানলার গরাদ ধরে চুপচাপ গুমোটে একা দাঁড়িয়ে থাকি
খাঁচায় ময়না ছটফট, বনের স্বাধীনতা চায়
রুখু হাওয়া দোল খায় ভেতর বাহিরে
বানপ্রস্থে যাবে রাজা এমন সময়ে।
পরদিন, ঠিক পরদিন বদল হয় দৃশ্যপট
আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে পুনরায় প্রতিমা চত্বরে
বকুলতলা বিছিয়ে মোরাম পাতে
রজনীগন্ধা গন্ধে ভরে যায় সমস্ত ভুবন
পাপড়ি ছুঁই, আদর করি
কাল বড়ো জ্বর ছিলো গায়ে, ছাখো আজ নেই

সীমা মিত্র

কম্পন

□

তাহলে ঘোষাল কাল চিঠি নিয়ে এসো
রবীন্দ্র সদনের ঘাসে দশটা পাঁচটার শরীর নিঃশব্দ হলেও
তুমি ডেকো—
আমি টগ্‌বগ্‌ রেসের ঘোড়ার মতো উষ্ণ হব।
এই পেশক্রিপশান তোমায় বাহান্নবার দিয়েছি
অথচ সাড়ে চারবার রেখেছি,
ঘোষাল
এ আমার দুশ্চিন্তার বুকখোলা হাওয়াই সার্ট।

সঞ্জয় রায়

শিলাবতী

□

তুমি স্নান করো, নিজেকে ভেজাও, আমি তত প্রতিহিংসাপরায়ণ
হয়ে উঠি আরো ;
ভেজা হাতে প্রাণভরে আমাকেই দণ্ডবিধি দাও, অথবা
বন্যার কচি বালিকার মতো আমার জীবাশ্মহাড় নিয়ে খেলা করো ;
মনে রেখো, ঐ হাড়, মনে রেখো, আগ্নেয়গিরির মতো লাভাস্রোত উসকে
দিতে পারে।
তুমি স্নান করো, শিলাবতী নদীর ভেতরে জল বেড়ে যায়, ঝাক্ ঝাক্
ভিড়ের ভেতর বড়ো বেশী নিরালম্ব মনে হয় তোমার শরীর
তুমি কি সহায় সম্বলহীন মানুষের ভেতরে ভেতরে পিপাসার জলসত্র মেলে
ধরতে পারো !
পারো ; তুমি যত পারো, আমি তত ভালোবাসার জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ
হয়ে উঠতে পারি !
শিলাবতী নদীর ভেতরে জল বাড়ে, ভেজা শেফালির মতো তোমার
শরীর ভিজলে
মেদিনীপুরের জল খুশি হয় আরো ;
তোমাকে বর্ষার ছোট ছত্রাকের মতো মনে হয়,
আমি তার নীচে এইবার বারবার ধূলিসাৎ হবো ॥

শচীন মোদক

জনশক্তির বনিয়াদ দৃঢ় হোল

□

অনেকক্ষণ সূর্য ডুবে গেছে ;
ফুটপাথের পাশে ডাস্টবিনের ধারে
ওদের ঝুপড়ি নিশ্চুপ।
কোলা ব্যাঙ, কাঠ পিঁপড়ে আর কেন্নোর
সুন্দর সহাবস্থান।
প্যাঁক প্যাঁক করে একটা ট্যাক্সি চলে গেল।
চুপ চুপ, ওখানে ক্ষীণ গোঁঙানি
নবজাতকের আবির্ভাব লগ্ন—
ছেঁড়াকানি জড়ানো এক রক্তের ডেলা

কুত্ কুত্ করে দেখল এই নতুন পৃথিবীটাকে
ওঁয়াও ওঁয়াও চিৎকারে জানান দিল সে এসেছে।
রাস্তার ধুলো, ডবল ডেকারের ডিজেল পোড়া ধোঁয়া
স্বাগত জানাল ওর এই আবির্ভাবকে ;
যেন সেই মহামানবের জন্ম হোল আবার
নেড়ী কুত্তার চিৎকার হোল তার জন্মমুহূর্তের স্বস্তিবচন
মন্ত্রবলে নিভে গেল ষ্ট্রীটলাইট লোড শেডিংয়ের দৌলতে
জননী যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ তমিস্রা নেমে এলো
রত্নগর্ভা ভবঘুরে উলঙ্গ মাগীটার চোখে—
লজ্জা লজ্জা পেয়ে মুখ লুকাল গাঢ় অন্ধকারে।
ক্ষুধার মূল্যে ক্ষণিক মৈথুনের ফসল ফলল
কল্লোলিনী কলকাতার ফুটপাথে।
আর একটি মহাপুরুষের জন্ম হোল।
জনশক্তির বনিয়াদ দৃঢ় হোল।

ঈশ্বর দত্ত

অন্ধকার গভীর—গভীরতর

□

শূন্য ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বিষাদ
হাতড়ে হাতড়ে হাতড়ে দেওয়ালটাও
পিচ্ছিল
কোথাও যাওয়া নয় আর
বিশ্রাম
দীর্ঘশ্বাস জমে জমে জমে অন্ধকার
জমাট
রাত বাড়ছে রাত বাড়ছে রাত বাড়ছে
নিঃঝুম !

গৌতম গুহ

প্রস্তাব

□

এসো তুমি দেখে যাও অবিষণ্ণ দুই চোখ মেলে
মেধাবী রাবণ এই ঘৃণ্যতায় নীল হয়ে গ্যাছে।
শ্বাসরোধী ধূম্রজাল ছিঁড়ে
শৃগাল পালায় এক মলঙ্গা লেনে
হাতে ব্যাগ, মিলশ্রমিকের দেনাপাওনা হিসেব পকেটে
আকাশের স্বেদরক্ত ক্রোধতপ্ত টুপ্‌টাপ ঝরে।

গাঢ় কিছু ফুল দিও সে মহান গুণ্ডার পকেটে
যার অবদানে এ পৃথিবী আজ লঙ্গরখানার মতো প্রিয়
গ্রীবাহীন উচ্চাশায় যদি পথে হেঁটে যেতে পারো
সাত্রীকে মন্ত্রী ভেবে আজানু কুর্ণিশ দিতে পারো
অনবদ্য মিথ্যাচারে মহাকাশ আলো হয়ে যাবে
তোমার মগজময় তা দিয়ে যাবে
সেই প্রতিভাভাস্বরী হাঁস
মাঝে মাঝে রাণী হন এ-দেশের যিনি
শুক্লপক্ষে ভাসান আকাশ।

জগন্ময় সেনগুপ্ত

এখন, এসময়

□

আসলে কোথাও তার জন্যে জায়গা ছিলোনা একটু বসার
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে কুকুরের মতো তার
জিভ থেকে ঝরে লালা।
কোথাও তার চোখে পড়েনা ডগ্‌ডগে সেই রেড সিগন্যাল
কেউ আর তাকে ডেকে বলেনা—'কিংশুক, তুমি কিংশুক
আহা, বোসো এইখানে।

দ্যাখো, কী প্রগাঢ় রক্তবিন্দু তোমার নিটোল কপোল দেশে।'
কেউ আর তাকে বোসতে বলেনা, অথচ স্ট্যাচু
পড়লেই দেখে আসনগুলো সবই পূর্ণ।
ফলতঃ এখন কিংশুক নির্দেশ দেয় অফিউসকে,
বলে—'কমরেড, বন্ধ করো, বন্ধ করো ঐ সংগীত
অথবা বাজাও মিছিলের আগে বিঠোফেনের ফিফথ্‌ সিম্ফনী।'

কিছুতেই তার মনে পড়ছেনা দুধ-সাদা ঐ হাতের স্নেহ
অথবা নদীর উত্তালতা।
কিছুতেই তার মনে পড়ছেনা মঙ্গলঘট, উলুধ্বনি।

এইভাবে আজও কিংশুক তাই ছুটতে থাকে, ছুটতে থাকে—
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে জপ কোরে যায় গুহ্যমন্ত্রের মতো সংলাপ ;
উনিশশো পাঁচ লাল সেলাম
উনিশশো পাঁচ লাল সেলাম

কঙ্কন নন্দী

ছুঁয়ে ফেলে

□

ছুঁয়ে ফেলে বড্ড কষ্ট দিলুম তোমাকে
জানা আছে দেবীর পাদপদ্ম রক্তজবা ছাড়া
আর কারো স্পর্শের অধিকার নেই।

তবু ভক্তির সূচ্যগ্র চূড়ায় বসে তোমার পদ্মপাতা পায়ে
হাত রেখেছি ভালোবাসায়।

ছুঁয়ে ফেলে বড্ড কষ্ট দিলুম তোমাকে
ট্রেনের জানলায় প্রতিদিন যে মন্দিরের কারুকার্য দেখা যায়
তার সিংহ দরোজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারতাম।

আমার ভয়ার্ত ইচ্ছার লালামিশ্রিত শব্দাবলী
ছুঁয়ে ফেলে বড্ড অন্যায় করেছি, কষ্ট দিলুম তোমাকে।

প্রবালকুমার বসু

বেঁচে আছি

□

বেঁচে থাকতে হবে, চারপাশে সকলে যেমন
বাঁচার চেষ্টায় আছে তেমনি ভাবেই যেন বাঁচি।
মরি কিংবা বাঁচি এধারে ওধারে নোংরা মাছি
সেই থেকে করে ভনভন।
ভালো নয়, এলোমেলো কোনো কিছুই—
সুস্থ পরিকল্পনা চেয়ে বাঁচি কিংবা মরি!
শুধুই যারা বেঁচে আছে, তাদের দেখে-দেখে
ছাড়পোকা, শামুক ও হায়নার কথা মনে আসে।
বেঁচে থাকতে হবে, চারপাশে সকলে যেমন
বেঁচে মরে আছে তেমনি ভাবেই কেন বাঁচি!

রাজা মজুমদার

কবিতা লিখি

□

কবিতা লিখি
পৃথিবীটাকে ভালবাসি বলেই—
কবিতার আরেক নাম জীবন!

কবিতা লিখি
অনাগত ভবিষ্যতে সুখী মানুষ দেখব—
এই আশায়

কবিতা লিখি
অনাগত ভবিষ্যতে নতুন পৃথিবী গড়ব—
এই আশায়!

কবিতা লিখি
কেননা জানি
একদিন না একদিন সেই সময় আসবে!

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দিনকাল

□

তিনি বললেন,
"সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।"
আমি দেখলুম,
ইজিচেয়ারে শয়ান ভদ্রলোকটির
থুতনির নীচে
আরও দু-দুটো থুতনি গজিয়ে গেছে।

তিনি বললেন,
"দিনকাল একদম পালটে গেছে।
কিস্সু হবে, এমন
লক্ষণ কোথাও দেখছি না।"
আমি দেখলুম,
তাঁর চশমার কাচ
হরিণঘাটার দুধের বোতলের
পাছার চেয়েও পুরু।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্বোধ্য

□

মাত্র বারো তের বছর বয়েস ছেলেটার, বললো, ওর মা, বাবা
কেউ নেই। অথচ আমার আছে, আমি তো এই দুঃখ পাই নি,
মনে হলো, হয়তো কোনো ভাবে আমি ওকে বঞ্চনা করেছি।

কোথায় থাকিস? জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে, সে বললো
কোথাও না। কথা বলার সময় সে ঝকঝকে ভাবে হাসে।
পাশের একজন লোক বললো, ও যেখানে সেখানে থাকে।

এ তো নতুন কিছু খবর নয়, আকাশের নীচে কিংবা
গাছ পালার আশ্রয়ে এখনো রয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমি
থাকি রীতিমতন সৌখিন বাড়িতে, গৃহহীনদের কথা চিন্তা করে
আমার গৃহত্যাগ করার কোনো মানে আছে কী?

চায়ের দোকানের দাম মিটিয়ে আমি উঠে পড়লুম।
তারপর গাড়ি চললো দুর্দান্ত গতিতে, দু'পাশে
সজল সুন্দর প্রকৃতি, গ্রাম বাংলার বিখ্যাত সৌন্দর্য, এ সব
দেখে চোখ না-জুড়োনো অন্যায়।

তবু বারবার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিত হয় এক প্রশ্ন ও
উত্তর:
তুই কোথায় থাকিস?
কোথাও না!
কিন্তু একথা বলার সময়ও ছেলেটি হেসেছিল কেন?

ব্রততী বিশ্বাস

কবিতার উপবাসে অমাবস্যার দিন

□

কবিতার উপবাসে অমাবস্যার দিন আজ
চাঁদকে খেয়েছে রাক্ষসী অন্ধকার
ভুলের মতো ফুটে আছে মায়াবী ফুল
কবিতার উপবাসে অমাবস্যার দিন আজ

চিতল হরিণের চোখে বিঁধে আছে অভিশাপ
একা মরে যাচ্ছে তার অন্তিম দোসর
কালনাগিনী ফুঁসে ওঠে জলের গহনে
যখন শেষ বিকেলের ছায়া ছাতিম পাতায়

এভাবে দিন যাবে, দিন যায় বলেই
এভাবে রাত আসে, রাত আসবে বলেই
নিঃসঙ্গ পেচক ডাকে, জোনাকীরা পলাতক
কবিতার উপবাসে অমাবস্যার দিন আজ।

কবির ঘরে একা লণ্ঠন

□

আজ সুখের সমতলে নয়
অসুখের বারান্দায়
ঝুঁকে আছে বিষাদ প্রতিমা
তার আলোর বর্ষা বিঁধে গ্যাছে
কবির বুকের জাজিমে।

কবির ঘরে একা লণ্ঠন দোলে
আজন্ম দুঃখের স্বাদ
জেগে থাকে তার ঠোঁটে, চোখের কোলে।

পরেশ মণ্ডল

কয়েকটি ছোট কবিতা

□

১

হাতঘড়ি
সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন
অটোরিক্সা

২

বৃষ্টি পড়ছে
ছাতার নিচে চারটে চোখ
রেললাইন

৩

টেবিলে বই
রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত
এ্যাস্‌ট্রে

৪

একলা পথ
ঘুঘু ডাকছে দূরে
উড়ন্ত বেলুন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণশিল্পী **অজিত পাণ্ডের** কণ্ঠে গণ-সঙ্গীতের নতুন পূজা রেকর্ড (No. 2226-0271) হয়েছে ইনরেকো থেকে।

* ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না পল রোবসন……
* একটা গল্প বলি শুনুন (আট ঘোড়ার গান)……
* একই আকাশ একই বাতাস……
* রাতকে বিতাইলাম হো দিনকে বিতাইলাম হো……

উত্তম দাশ

শব্দেরও গন্ধ থাকে

□

তিন বা তিপ্পান্ন টাকায় বিছানা বদল করা গন্ধের মতো
মেয়েছেলে শব্দের গায়ে একটা গন্ধ লেপ্টে থাকে

রমণী শব্দের যোগ্য রমণীরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে
শরীরের চন্দন রাত্রির জাগরণ অর্থময় করে দিতো
দাঁতের চিকন চিবুকে ভোরের আয়না
গোধূলির মলাটে আঁকানো স্বর্ণরেখা
স্পর্শের তীব্রতা জন্মান্তর থেকে ছেঁকে আনা
এই রমণীর শরীরের ঘ্রাণ শেষবারের মতো
জীবনানন্দ শুঁকেছিলেন দীর্ঘ ভ্রমণের পর
ঘামের কি মসৃণতা ঝরে যায়
পৃথিবীর সেইসব স্বর্গীয় শব্দের অধিকারিণীরা কোথায় গেলে

কবিরা কি দেখো : অনেক সুন্দরী মেয়েছেলে শব্দ পরে চলে যায়
বিয়ারে পিছল মুখ স্তনের ডৌল ভাঙা
অ্যানে-ফ্রেন্সে নিড়ানো পশম কৃত্রিম গন্ধের বাসি
পাছার ঘের মাপতে মাপতে শুনতে পাও—এক বাঁও দুই বাঁও
জলমাপা নাবিকের কণ্ঠস্বর স্বর্গের ঘৃতকুমারী এবং
হাড়কাটার পুঁটিরাণী একই বিছানায় তিন বা তিপ্পান্ন টাকায়

মেয়েছেলে শব্দের গায়ে একটা গন্ধ লেপ্টে থাকে

সুনীল কুমার দত্ত

১৯৭৮-এর ১৫ই আগষ্ট

□

সাবান গোলা জলের মতো আকাশ
আর দমকা হাওয়া, দিন শুরু হয় এরকম
এইরকম কোন এক দিনে পাগলটা আসে আমাদের পাড়ায়
হাতে একটা থেঁটে লাঠি, রোজ সকালবেলা,
ছোটাছুটি করে এমাথা ওমাথা, আর
পিটোতে থাকে নিজের পিঠ, পাগলটা,
হু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে আজ—

হু হু হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে যত রাজ্যের মেঘ
দিন-শেষের রঙ ধরে দিন-শুরুর আকাশে
কালো কালো আর কালো ছায়ায়
পিঠের সেই কালো দাগ আরো কালো
আর বিশাল ফুটে থাকে আড়াআড়ি, দূরে,
ইস্কুল বাড়ির উঠোনে সাদা জামার নিচে নীল স্কার্ট পরা মেয়েরা
দেশাত্মবোধক গান গায়, মেঘের ছায়ায়,
পুরোনো কালের ফটোর মতো মনে হয় তাদের
আকাশ কাঁপিয়ে ঝমঝম করে নেমে আসে বৃষ্টি
সেক্রেটারি মশাই দ্রুত তুলে দেয় পতাকা, দ্রুত,
ঢুকে পড়ে ইস্কুল বাড়ির ভেতর, পেছন পেছন মেয়েরা—

মজা পুকুর পাড়ের যে কোন গাছের মতো পতাকা
ভিজতে থাকে নিঃসঙ্গ।
এরই মধ্যে পাড়ার উৎসাহী তরুণরা
ড'মোড়ে বসিয়ে দেয় দুটো চোঙা
সারাদিন তাতে গান বাজে, সারাদিন থেপে থেপে বৃষ্টি হয়
বৃষ্টির প্রবল শব্দে ডুবে যায় গান, আবার ভেসে ওঠে
পতাকা শুকোয়, শুকিয়ে যাবার আগেই
বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয় পতাকা আবার।

শ্যামল পুরকায়স্থ

ক্রম ধূসরিত নদী

□

মহাকাশ থেকে নিরুপম মাধ্যাকর্ষণে শ্রাবণী শব্দধারা অবিরাম
নক্ষত্রের চালচিত্রে অসীমের নীল দ্যুতি উৎসাহব্যঞ্জক।
অকস্মাৎ নদী সম্ভবা কোনো বাক্য প্রণয়ে
দুরন্ত ছোটাছুটি শব্দাবলীর। স্বাগত, কোটি আলোকবর্ষ স্বাগত।

ঝংকৃত পদাবলীতে সস্নেহ আগমনী সম্ভাষণ—
অনির্বচনীয় আনন্দসঙ্গিনী হও।
ম্যারাথন প্রতীক্ষায় অনুপল-বিপল নেহাৎ তুচ্ছ বিষয়।
অনন্তের ঘুলঘুলি দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন ফিচেল পাখির আনাগোনা—
নাদব্রহ্ম অযৌক্তিক প্রাঙ্গণে কেন যে!

পরমাদব্রহ্মে অন্তর্জগতে প্রলয়, উষ্ণ অস্রুপ্রপাত ; ঘোরে নদীপথ।
পাথরের ঢলে ঝুমুর-ঝুমুর ধ্বনিতরঙ্গের লাস্যময়ী সমুচ্চারণ :

বন্দিনী নই কারো, জ্যোৎস্না নেপথ্যচারী মেঘ সহচরী।
অনুপস্থিত সেই রেডিয়াম আলো, সেই সাংকেতিক অবিনশ্বরতা ;
কিলবিল মেঘে নাগিনীর রূপারোপ অনাদিকালের।
নীলাভ বিষক্রিয়া অনবচ্ছিন্নভাবে শিরা-উপশিরায়—
হাওয়ায় দুঃখ ভাসে—সূর্যগ্রহণে ক্রম ধূসরিত নদী।

কাজল চক্রবর্তী

স্নায়ু-যুদ্ধে : ৩৮

□

শিউলি শৈশব তুমি
জলজ্বলে পতাকায় মূর্ত।
আমার স্বপ্নের সেতু গড়েছিলে
শামুক যে ভাবে চলে নিজস্ব ভঙ্গিমায়।
তোমার দেশে, বেবিফুডে ভেজাল এবং চালে কাঁকর থাকলেও
টাটকা কাটা মাংস ছিলো লাল।
ঋতুর সংকেত ছিলো
প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিলো ধাতব কম্পাস।
গাছের কোটর থেকে কাঠবেড়ালির মতো লাফিয়ে নামতে পারতে
লম্বা-ঠোঁট টিয়ে হয়ে বলতে পারতে
"বাঁচো বাঁচো, বাঁচাটাই জীবন।"

শিউলি-শৈশব তুমি এ মুহূর্তে কথামালার দেশ॥

With Best Compliments From

RAMVIJAY AND CO.

CALCUTTA

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আজকাল

□

শ্রীঅজিত মৈত্র
শ্রদ্ধাভাজনেষু

আজকাল আর কোনো কারণেই শরীরে একবিন্দু ঝাঁকুনি লাগে না
না আনন্দ না বিষাদ
না ক্রোধ না ভালবাসা
আজকাল আর কোনো দৃশ্যেই হৃৎপিণ্ডে কাঁসর বাজে না!

মারমুখো আগুনে ঝাঁপিয়ে
কেউ হয়তো ফিরিয়ে আনল এক আধসেদ্ধ দেবশিশু
দুবাহু বাড়িয়ে তাকে বুকে নিয়ে ব'লতে পারি না, সাবাস্!
প্রিয়তম ধ্বনি নিয়ে কেউ হয়তো কেচ্ছা ক'রল প্রকাশ্য রাস্তায়
তার কলার ধরে আমি আর গর্জে উঠিনা, খবরদার!
কোনো প্রিয় প্রতিকৃতি হয়তো নষ্ট পাপোষে গিয়ে লুটিয়ে প'ড়ল
চোখের জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে আমি আর চেঁচিয়ে উঠিনা, বন্ধু ফিরে এসো!

আজকাল আর কোনো কারণেই শরীরে একবিন্দু ঝাঁকুনি লাগে না
শবাধারের মতো নিরবধি হিমযুগে আকণ্ঠ ডুবে জেগে আছি।